بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

IOM

কুরআন হাদিসের আলোকে শবে মে’রাজ

Submitted To

Ustaz Abdul Wahid

Subject: RAM-302

Submitted By

Mahfuza Haque

Batch-202

Roll# 20202178

সূচিপত্র

লেখকের কথা

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ

আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি এত বড় একটি কাজ সম্পাদন করার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। অজস্র শুকরিয়া আদায় করছি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী দয়াময় রবের, যিনি "কোরআন-হাদীসের আলোকে শবে মে'রাজ" এসাইনমেন্ট এর কাজটি সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন।

সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী। দোয়া করবেন আল্লাহ তা'আলা যেন এসাইনমেন্টটিকে কবুল করে নেন; সাথে এই অধমকেও। এছাড়া, এসাইনমেন্টটি যেন আমার এবং যারা আমাকে কাজটি করতে সাহায্য সহযোগীতা করেছেন, আমার পরিবার যারা আমার ব্যস্ততার সময় ধৈর্য ধারণ করেছেন তাঁদের নাজাতের উসিলা হয়ে যায়। বাকি কাজগুলো যেন পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে করতে পারি সেজন্যও দোয়া করবেন।

পরিশেষে বলতে চাই, কোনো মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই এসাইনমেন্টের কোন অংশে কোন ভুলভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে আমাকে অবগত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ইন শা আল্লাহ, পরবর্তীকে তা ঠিক করা হবে।

ভূমিকা

রসূল সাঃ এর শোকের বছরের ঘটনাগুলো হয়তো তখনও তার মন ভারী করে রেখেছিল। হয়তো একটি দিনও কাটত না তিনি আমাদের মা খাদিজা রাঃ এর কথা স্মরণ করতেন না, তার চাচা আবু ত্বলিবের অনুপস্থিতি অনুভব করতেন না, ত্বয়িফের লোকদের নিক্ষেপ করা পাথরগুলো হয়তো স্মৃতির পথ দিয়ে ছুটে এসে তখনও তার অন্তরে আঘাত করতো। কিন্তু আল্লাহ তো আশ্বাস দিয়েছেন ইন্না মা’আল ইউসরি ইউসরা, নিশ্চয় কষ্টের সাথেই আছে সহজতা। এমন অকল্পনীয় পরীক্ষা পর্বের পর তার প্রিয় হাবীব সাঃ এর জন্য মহান আল্লাহ এমন এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা রেখেছিলেন যা মানব ইতিহাসে আর কারো পাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি।

ইসরা ও মে'রাজের ঘটনা নবী জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, নবীজীর রিসালাতের অনেক বড় মুজিযা আর উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি বড় নিআমত। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআলা যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মান আরো বৃদ্ধি করেছেন, তেমনি তাঁর উচ্চ মর্যদা সম্পর্কে অবগত করেছেন সৃষ্টিজগৎকে। এই ঘটনা যেভাবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন ও সীরাতের সাথে সম্পর্কিত, সেভাবে তা ইসলামী আক্বীদা ও বিশ্বাসেরও অংশ। এই ঘটনায় একদিকে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও নির্দেশনা, অন্যদিকে সেখানে লুকিয়ে রয়েছে অসংখ্য ইলাহী হিকমত ও রহস্য। কিন্তু নবীজীর সশরীরে ইসরা ও মে'রাজের বাস্তবতার উপর ঈমান আনার পর মুমিনের

জন্য যে প্রয়োজনটি সর্বাগ্রে অনুভূত হয় তা হল কুরআনে কারীম ও সহীহ হাদীসের আলোকে ইসরা ও মে'রাজের পুরো ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ইলম হাসিল করা। এই প্রয়োজনটি আরো প্রকটভাবে দেখা দেয় যখন অনির্ভরযোগ্য কিছু পুস্তিকা ও চটি বই, দায়িত্বহীন অনেক বক্তা ও তাদের দায়িত্বজ্ঞানশূণ্য কতক বক্তব্যের কল্যাণে (!) অনেক মানুষকে ইসরা ও মে'রাজের সঠিক ইলম থেকেও দুঃখজনকভাবে বঞ্চিত হতে দেখা যায়। ফলে তাদের মন ও মননে দিনদিন ভিত্তিহীন কিছু বর্ণনাই গ্রথিত হয়ে যাচ্ছে।

বক্ষমান প্রবন্ধে কোরআন হাদিসের আলোকে ইসরা এবং মে'রাজের ঘটনাবলী আলোচনা করা হয়েছে।

ইসরা এবং মে’রাজ সংক্রান্ত আয়াতসমূহের তাফসীর

সূরা ইসরা আয়াত- ১ , তাফসীর ইবনে কাসীর

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡۤ اَسۡرٰی بِعَبۡدِہٖ لَیۡلًا مِّنَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ اِلَی الۡمَسۡجِدِ الۡاَقۡصَا الَّذِیۡ بٰرَکۡنَا حَوۡلَہٗ لِنُرِیَہٗ مِنۡ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیۡعُ الۡبَصِیۡرُ

ভাবার্থঃ পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আকসায়, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বারাকাতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তার পবিত্রতা, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি সবকিছুর উপর পূর্ণক্ষমতাবান। তাঁর ন্যায় ক্ষমতা কারো মধ্যে নেই। তিনিই ইবাদতের যোগ্য এবং একমাত্র তিনিই সমস্ত সৃষ্টজীবের লালন-পালনকারী। তিনি তাঁর বান্দা অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) একই রাত্রির একটা অংশে মক্কা শরীফের মসজিদ হতে বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যান, যা হযরত ইবরাহীমের (আঃ) যুগ হতে নবীদের (আঃ) কেন্দ্রস্থল ছিল। এ কারণেই সমস্ত নবীকে (আঃ) সেখানে তার পাশে একত্রিত করা হয় এবং তিনি সেখানে তাঁদেরই জায়গায় তাঁদের ইমামতি করেন। এটা একথাই প্রমাণ করে যে, বড় ইমাম ও অগ্রবর্তী নেতা তিনিই। আল্লাহর দুরূদ ও সালাম তাঁর উপর ও তাঁদের সবারই উপর বর্ষিত হোক।
মহান আল্লাহ বলেনঃ এই মসজিদের চতুষ্পার্শ্ব আমি ফল-ফুল, ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি দ্বারা বরকতময় করে রেখেছি। আমার এই মর্যাদা সম্পন্ন নবীকে (সাঃ) আমার বড় বড় নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করা-ই ছিল আমার উদ্দেশ্য, যেগুলি তিনি এ রাত্রে দর্শন করেছিলেন।
আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন, কাফির, বিশ্বাসকারী এবং অস্বীকারকারী সমস্ত বান্দার কথা শুনে থাকেন এবং দেখে থাকেন। প্রত্যেককে তিনি ওটাই দেন যার সে হকদার, দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও।
মে'রাজ সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে যেগুলি এখন বর্ণনা করা হচ্ছেঃ
হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মি'রাজের রাত্রে যখন কা'বাতুল্লাহ শরীফ হতে রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় সেই সময় তার নিকট তিনজন ফেরেশতা আগমন করেন, তাঁর কাছে ওয়াহী করার পূর্বে। এ সময় তিনি বায়তুল্লাহ শরীফে শুয়ে ছিলেন। তাদের মধ্যে প্রথম জন জিজ্ঞেস করেনঃ "ইনি এই সবের মধ্যে কে?" মধ্যজন উত্তরে বলেনঃ "ইনি এসবের মধ্যে উত্তম।" তখন সর্বশেষজন বলেনঃ "তা হলে তাঁকে নিয়ে চল।" এ রাত্রে এটুকুই ঘটলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদেরকে দেখতে পেলেন না। দ্বিতীয় রাত্রে আবার এ তিনজন ফেরেশতা আসলেন। ঘটনাক্রমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ সময়েও ঘুমিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর ঘুমন্ত অবস্থা এমনই ছিল যে, তাঁর চক্ষুদ্বয় ঘুমিয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল জাগ্রত। নবীদের (আঃ) নিদ্রা এরূপই হয়ে থাকে। এ রাত্রে তারা তার সাথে কোন আলাপ আলোচনা করেন নাই। তারা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে যমযম কূপের নিকট শায়িত করেন এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ) স্বয়ং তার বক্ষ হতে গ্রীবা পর্যন্ত বিদীর্ণ করে দেন এবং বক্ষ ও পেটের সমস্ত

জিনিস বের করে নিয়ে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করেন যখন খুব পরিষ্কার হয়ে যায় তখন তার কাছে একটা সোনার থালা আনয়ন করা হয় যাতে বড় একটি সোনার পেয়ালা ছিল। ওটা ছিল হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ। ওটা দ্বারা তাঁর বক্ষ ও গলার শিরাগুলিকে পূর্ণ করে দেন। তারপর নিয়ে যাওয়া হয়। তথাকার দরজাগুলির একটিতে করাঘাত করা হয়। ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেনঃ “কে?” উত্তরে বলা হয়ঃ “জিবরাঈল (আঃ)।” আবার তাঁরা প্রশ্ন করেনঃ “আপনার সাথে কে আছেন?” জবাবে তিনি বলেনঃ “আমার সাথে রয়েছেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।” পুনরায় তারা জিজ্ঞেস করেনঃ “তাঁকে কি ডাকা হয়েছে?” হযরত জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেনঃ “হা” এতে সবাই খুবই খুশী হন এবং “মারহাবা' বলে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁকে নিয়ে যান। যমীনে যে আল্লাহ তা’আলা কি করতে চান তা আকাশের ফেরেশতারাও জানতে পারেন না। যে পর্যন্ত না তাঁদেরকে জানানো হয়। দুনিয়ার আকাশের উপর হযরত আদমের (আঃ) সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তার সাথে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) পরিচয় করিয়ে দেন। তাকে বলেনঃ “ইনি আপনার পিতা হযরত আদম (আঃ)। তাকে সালাম দিন।” তিনি তাঁকে সালাম দেন। হযরত আদম (আঃ) সালামের জবাব দেন এবং “মারহাবা” বলে অভ্যর্থনা জানান ও বলেনঃ “আপনি আমার খুবই উত্তম ছেলে।” সেখানে প্রবাহিত দুটি নহর দেখে তিনি হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “এ নহর দুইটি কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “এ দু'টো হলো নীল ও ফোরাতের উৎস। তারপর তাঁকে আসমানে নিয়ে যান। তিনি আর একটি নহর দেখতে পান। তাতে ছিল মনিমুক্তার প্রাসাদ এবং ওর মাটি ছিল খাঁটি মিশ্কে আম্বর। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ “এটা কি নহর?” উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ “এটি হচ্ছে নহরে কাওসার। এটা আপনার প্রতিপালক আপনার জন্যে তৈরী করে রেখেছেন।” এরপর তাঁকে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে যান। তথাকার ফেরেশতাদের সাথেও অনুরূপ কথাবার্তা চলে। তারপর তাঁকে নিয়ে তৃতীয় আকাশে উঠে যান। সেখানকার ফেরেশতাদের সাথেও এরুপ প্রশ্ন ও উত্তরের আদান প্রদান হয় যেরূপ প্রথম ও দ্বিতীয় আকাশে হয়েছিল। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) নিয়ে চতুর্থ আকাশে উঠে যান। তথাকার ফেরেশতাগণও অনুরূপ প্রশ্ন করেন ও উত্তর পান। তারপর পঞ্চম আকাশে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও অনুরূপ কথা শোনা যায়। এরপর তারা ষষ্ঠ আকাশে উঠে যান। সেখানেও এরূপই কথাবার্তা চলে। তারপর সপ্তম আকাশে গমন করেন এবং তথায়ও এরূপই কথাবার্তা হয়। বর্ণনাকারী হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেনঃ প্রত্যেক আকাশে তথাকার নবীদের (আঃ) সাথে রাসুলুল্লাহর (সঃ) সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁদের নাম করেছিলেন। যাদের নাম আমার স্মরণ আছে তারা হলেনঃ দ্বিতীয় আকাশে হযরত ইদরীস (আঃ), চতুর্থ আকাশে হযরত হারুণ (আঃ), পঞ্চম আকাশে যিনি ছিলেন তার নাম আমার মনে নেই, ষষ্ঠ আকাশে ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং সপ্তম আকাশে ছিলেন

হযরত মূসা (আঃ)। হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) উপর এবং অন্যান্য সমস্ত নবীর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এখান হতেও উপরে উঠতে থাকেন তখন হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহ! আমার ধারণা ছিল যে, আমার চেয়ে বেশী উপরে আপনি আর কাউকেও উঠাবেন না। এখন ইনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে কত উপরে উঠাবেন তা একমাত্র আপনিই জানেন।" শেষ পর্যন্ত তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছে যান। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটবর্তী হন। ফলে তাদের মধ্যে দু'ধনুকের ব্যবধান থাকে বা তার চেয়েও কম। অতঃপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তার কাছে ওয়াহী করা হয়, যাতে তার উম্মতের উপর প্রত্যহ দিনরাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। যখন তিনি সেখান হতে নেমে আসেন তখন হযরত মূসা (আঃ) তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ "আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে আপনি কি হুকুম প্রাপ্ত হলেন?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "দিন রাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায।" হযরত মূসা (আঃ) এ হুকুম শুনে বললেনঃ "এটা আপনার উম্মতের ক্ষমতার বাইরে। আপনি ফিরে যান এবং কমানোর জন্যে প্রার্থনা করুন।" তার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জিবরাঈলের (আঃ) দিকে পরামর্শ চাওয়ার দৃষ্টিতে তাকান এবং তিনি ইঙ্গিতে সম্মতি দান করেন। সুতরাং তিনি পুনরায় আল্লাহ তা'আলার নিকট গমন করেন এবং স্বস্থানে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেনঃ "হে আল্লাহ! হালকা করে দিন। এটা পালন করা আমার উম্মতের সাধ্য হবে না।" আল্লাহ তা'আলা তখন দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফিরে আসলেন। হযরত মূসা (আঃ) আবার তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ "কি হলো?" জবাবে তিনি বললেনঃ "দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন।" একথা শুনে হযরত মূসা (আঃ) তাকে বললেনঃ "যান, আরো কমিয়ে আনুন।" তিনি আবার গেলেন। আবার কম করা হলো এবং শেষ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায থাকলো। হযরত মূসা (আঃ) তাকে আবারও বললেনঃ "দেখুন, বাণী ইসরাঈলের মধ্যে আমি আমার জীবন কাটিয়ে এসেছি। তাদের উপর এর চেয়েও কমের নির্দেশ ছিল, তবুও তারা ওর উপর ক্ষমতা রাখে নাই। ওটা পরিত্যাগ করেছে। আপনার উম্মত তো তাদের চেয়েও দুর্বল, দেহের দিক দিয়েও, অন্তরের দিক দিয়েও এবং চক্ষু কর্ণের দিক দিয়েও। সুতরাং আপনি আবার যান এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট এটা আরো কমানোর জন্যে আবেদন করুন।" অভ্যাস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত জিবরাঈলের (আঃ) দিকে তাকালেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাকে উপরে নিয়ে গেলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন জানালেনঃ "হে আল্লাহ! আমার উম্মতের অন্তর, কর্ণ, চক্ষু এবং দেহ দুর্বল। সুতরাং দয়া করে এটা আরো কমিয়ে দিন তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ "হে মুহাম্মদ (সাঃ)! "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ "লাব্বায়কা

ওয়া সা'দায়কা আমি আপনার নিকট হাজির আছি)।" আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ "জেনে রেখো যে, আমার কথার কোন পরিবর্তন নাই। আমি যা নির্ধারণ করেছি তাই আমি উম্মুল কিতাবে লিখে দিয়েছি। পড়ার হিসেবে এটা পাঁচই থাকলো, কিন্তু সওয়াবের হিসেবে পঞ্চাশই রইলো।" যখন তিনি ফিরে আসলেন তখন হযরত মূসা (আঃ) তাকে বললেনঃ "প্রার্থনা মঞ্জুর হলো কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "হা, কম করা হয়েছে অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্তের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব পূর্ণ হয়েছে। প্রত্যেক সৎ কাজের সওয়াব দশগুণ করা হয়েছে।" হযরত মূসা (আঃ) আবার বললেনঃ "আমি বাণী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করেছি। তারা এর চেয়ে হালকা হুকুমকেও পরিত্যাগ করেছে। সুতরাং আপনি আবার গিয়ে প্রতিপালকের কাছে এটা আরো কমানোর আবেদন করুন। এবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জবাব দিলেনঃ "হে কালীমুল্লাহ আঃ)! এখন তো আমি আবার তার কাছে যেতে লজ্জা পাচ্ছি" তখন তিনি বললেনঃ "ঠিক আছে। তাহলে যান ও আল্লাহর নামে শুরু করে দিন।" অতঃপর তিনি জেগে দেখেন যে, তিনি মসজিদে হারামে রয়েছেন।[1]

কেউ কেউ এটাকে স্বপ্নের ঘটনা বলেছেন যা এর শেষে এসেছে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

এই হাদীসের "তিনি আল্লাহর অতি নিকটবর্তী হন, এমনকি তাদের মধ্যে দু'ধনুকের ব্যবধান থাকে বা তার চেয়েও কম" এই কথাগুলিকে ইমাম হাফিয আবু বকর বায়হাকী (রঃ) শুরায়েক নামক বর্ণনাকারীর বাড়াবাড়ি বলে উল্লেখ করেছেন এবং এতে তিনি একাকী রয়েছেন। এজন্যেই কোন কোন গুরুজন বলেছেন যে, এ রাত্রে

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) আয়াতগুলিকে এর উপর স্থাপন করেছেন যে, তিনি হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) দেখেছিলেন। এটাই সঠিকতম উক্তি এবং ইমাম বায়হাকীর (রঃ) কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন হযরত আবু যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনি কি আল্লাহ তাআলাকে দেখেছেন?" তখন উত্তরে তিনি বলেনঃ "তিনি তো নূর! সুতরাং

---

[1] এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারীর কিতাবুত তাওহীদ এবং সিফাতুন্নবী (সাঃ)-এর মধ্যেও রয়েছে। এই রিওয়াইয়াতটিই শুরায়েক ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু আবূ নামর (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে। কিন্তু নিজের স্মরণ শক্তির ত্রুটির কারণে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারেন নাই।

আমি কি করে তাকে দেখতে পারি?” আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ “আমি নূর (জ্যোতি দেখেছি।)” যা সূরায়ে নাজমে রয়েছেঃ

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ

অর্থাৎ “অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী” (৫৩:৮)
এর দ্বারা হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে, যেমন উক্ত তিনজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে কেউই এই আয়াতের এই তাফসীরে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমার কাছে “বুরাক' আনয়ন করা হয়, যা গাধার চেয়ে উচু ও খচ্চরের চেয়ে নীচু ছিল। ওটা ওর এক এক কদম এতো দূরে রাখছিল যত দূর ওর দৃষ্টি যায়। আমি ওর উপর সওয়ার হলাম এবং সে আমাকে নিয়ে চললো। আমি বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছে গেলাম এবং ওকে দ্বারের এ শিকলের সাথে বেঁধে দিলাম যেখানে নবীগণ বাধতেন। তারপর আমি মসজিদে প্রবেশ করে দু' রাক'আত নামায পড়লাম। যখন সেখান থেকে বের হলাম তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে একটি পাত্রে সূরা ও একটি পাত্রে দুধ আনলেন। আমি দুধ পছন্দ করলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ “আপনি ফিত্‌রত (প্রকৃতি) পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন।” তারপর উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনার মতই তিনি প্রথম আকাশে পৌঁছলেন, ওর দরজা উন্মুক্ত করালেন, ফেরেশতাগণ প্রশ্ন করলেন, জবাব পেলেন। প্রত্যেক আকাশেই অনুরূপ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। প্রথম আকাশে হযরত আদমের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি মারহাবা বললেন এবং কল্যাণের জন্যে দুআ" করলেন। দ্বিতীয় আকাশে হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) ও হযরত ঈসার (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা একে অপরের খালাতো ভাই ছিলেন। তারা দু'জনও তাকে মারহাবা বললেন এবং কল্যাণের জন্যে প্রার্থনা করলেন। তৃতীয় আকাশে সাক্ষাৎ হলো হযরত ইউসুফের (আঃ) সাথে যাকে অর্ধেক সৌন্দর্য দেয়া হয়েছিল। তিনিও মারহাবা বললেন ও মঙ্গলের দুআ" করলেন। তারপর চতুর্থ আকাশে হযরত ইদরীসের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হলো, যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَرَفَعْنَـٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا

অর্থাৎ “আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ মর্যাদায়।”

পঞ্চম আকাশে সাক্ষাৎ হয় হযরত হারূণের (আঃ) সাথে। ষষ্ঠ আকাশে হযরত মুসার (আঃ) সাথে। সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) বায়তুল মা'মূরে হেলান দেয়া অবস্থায় দেখতে পান। বায়তুল মা'মুর প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা গমন করে থাকেন। কিন্তু আজ যারা যান

তাঁদের পালা কেয়ামত পর্যন্ত আসবে না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছেন, যার পাতা ছিল হাতীর কানের সমান এবং যার ফল ছিল বৃহৎ মৃৎপাত্রের মত। ওটাকে আল্লাহ তা'আলার আদেশে ঢেকে রেখেছিল। ওর সৌন্দর্যের বর্ণনা কেউই দিতে পারে না। তারপর ওয়াহী হওয়া, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়া এবং হযরত মুসার (আঃ) পরামর্শ ক্রমে ফিরে গিয়ে কমাতে কমাতে পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত পৌঁছার বর্ণনা রয়েছে। তাতে এও রয়েছে যে, পরিশেষে রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) বলা হয়ঃ "যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করে, যদি সে ওটা করতে না পারে তবুও তার জন্যে একটি নেকী লিখা হয়। আর যদি করে ফেলে তবে দশটি নেকী সে পেয়ে থাকে। পক্ষান্তরে কেউ যদি কোন পাপ কার্যের ইচ্ছা করে অতঃপর তা না করে তবে তার জন্যে কোন পাপ লিখা হয় না। আর যদি করে বসে তবে একটি মাত্র পাপ লিখা হয়।"[2] এ হাদীস দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, যেই রাত্রে
রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বায়তুল্লাহ হতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয় সেই রাত্রেই মি'রাজও হয় এবং এটা সত্যও বটে। এতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই। মুসনাদে আহমদে রয়েছে যে, বুরাকের লাগামও ছিল এবং জিন বা গদীও ছিল। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সওয়ার হওয়ার সময় যখন সে ছটফট করতে থাকে। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাকে বলেনঃ "তুমি এটা কি করছো? আল্লাহর কসম! তোমার উপর ইতিপূর্বে এঁর চেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কখনো সওয়ার হয় নাই।" একথা শুনে বুরাক সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ "যখন আমাকে আমার মহামহিমান্বিত প্রতিপালকের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আমার গমন এমন কতকগুলি লোকের পার্শ্ব দিয়ে হয় যাদের তামার নখ ছিল, যার দ্বারা তারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষ আঁচড়াচ্ছিল ছিল।" আমি হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলামঃ "এরা কারা?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "এরা হচ্ছে ওরাই যারা লোকের গোশত ভক্ষণ করতো (অর্থাৎ গীবত করতো) এবং তাদের মর্যাদার হানি করতো।"

সুনানে আবি দাউদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন আমি হযরত মুসার (আঃ) কবরের পার্শ্ব দিয়ে গমন করি তখন তাকে ওখানে নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পাই।" হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্কে (সাঃ) মাসজিদুল আকসার বায়তুল মুকাদ্দাসের চিহ্নগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতে শুরু করে দেন। তিনি বলতেই আছেন এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাস্ল (সঃ)! আপনি সত্য বর্ণনাই দিচ্ছেন এবং আপনি চরম সত্যবাদী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।" হযরত আবূ বকর (রাঃ) মাসজিদুল আকসা পূর্বে দেখেছিলেন।

---

[2] এ হাদীসটি এভাবে মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমেও এভাবে বর্ণিত আছে।

মুসনাদে বাযযারে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "আমি শুয়েছিলাম এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং আমার দু'কাধের মাঝে হাত রাখেন। আমি তখন দাঁড়িয়ে গিয়ে এক গাছে বসে যাই যাতে পাখীর বাসার মত কিছু ছিল। একটিতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বসে যান। তখন এ গাছটি ফুলে উঠলো ও উঁচু হতে শুরু হলো, এমনকি আমি ইচ্ছা করলে আকাশ ছুঁয়ে নিতে পারতাম। আমি তো আমার চাদর ঠিক করছিলাম, কিন্তু দেখলাম যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) অত্যন্ত বিনীত অবস্থায় রয়েছেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহর মা'রেফাতের জ্ঞানে তিনি আমার চেয়ে উত্তম। আকাশের একটি দরজা আমার জন্যে খুলে দেয়া হলো। আমি এক যবরদস্ত ও জাকজমকপূর্ণ নূর দেখলাম যা পর্দার মধ্যে ছিল। আর ওর এদিকে ছিল ইয়াকূত ও মণিমুক্তা তারপর আমার কাছে অনেক কিছু ওয়াহী করা হয়।"

দালায়েলে বায়হাকীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাহাবীদের জামাআতে বসে ছিলেন, এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন এবং অঙ্গুলি দ্বারা পিঠে ইশারা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার একটি গাছের দিকে চললেন যাতে পাখীর বাসার মত বাসা ছিল। (শেষপর্যন্ত) তাতে এও আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যখন আমাদের দিকে নূর অবতীর্ণ হলো তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। (শেষ পর্যন্ত)"
অতঃপর তিনি বলেন এরপর আমার কাছে ওয়াহী আসলোঃ নবী এবং বাদশাহ হতে চাও, না নবী ও বান্দা হয়ে জান্নাতী হতে চাও?" হযরত জিবরাঈল (আঃ) এভাবেই বিনয়ের সাথে পড়ে ছিলেন, ইশারায় তিনি আমাকে বললেনঃ "বিনয় অবলম্বন করুন।" আমি তখন উত্তরে বললামঃ হে আল্লাহ! আমি নবী ও বান্দা হতে চাই।"[3]

মুসনাদে বাযযারে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন। কিন্তু এ রিওয়াইয়াতটিও গারীব।[4]

---

[3] দালায়েলে বায়হাকীর এই রিওয়াইয়াত যদি সঠিক হয় তবে সম্ভবতঃ এটা মে'রাজের ঘটনা না হয়ে অন্য কোন ঘটনা হবে। কেননা, এতে বায়তুল মুকাদ্দাসের কোন উল্লেখ নেই এবং আকাশের আরোহণেরও কোন কথা নেই। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

[4] যে সহীহ হাদীসে মাত্র একজন বর্ণনাকারী থাকেন তাকে গারীব হাদীস বলা হয়।

তাফসীরে ইবনু জারীরে বর্ণিত আছে যে, বুরাক যখন হযরত জিবরাঈলের (আঃ) কথা শুনে এবং রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) সওয়ার করিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করে তখন তিনি পথের এক ধারে এক বুড়িকে দেখতে পান। এই বুড়িটি কে তা তিনি হযরত জিবরাঈলের (আঃ) কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেনঃ চলুন।" আবার চলতে চলতে পথে কোন একজনকে দেখতে পান যে তাঁকে ডাকতে রয়েছে। আরো কিছু দূর গিয়ে তিনি আল্লাহর এক মাখলুখকে দেখতে পান, যে উচ্চ স্বরে বলতে রয়েছেঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اَوَّلَ السَّلاَمِ عَلَيْكَ يَا اُخِرَ السَّلاَمِ عَلَيْكَ يَا حَاشِرِ

হযরত জিবরাঈল (আঃ) সালামের জবাব দিলেন। দ্বিতীয়বারও এইরূপই ঘটলো এবং তৃতীয়বারও এটাই ঘটলো। শেষ পর্যন্ত তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে গেলেন। সেখানে তার সামনে পানি, মদ ও দুধ হাজির করা হলো। তিনি দুধ গ্রহণ করলেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ "আপনি ফিতরাতের (প্রকৃতির) রহস্য পেয়ে গেছেন। যদি আপনি পানির পাত্র নিয়ে পান করতেন তবে আপনার উম্মত ডুবে যেতো। পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো।" অতঃপর রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সামনে হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে তার যুগের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত নবীকে পেশ করা হলো। তিনি তাদের সবারই ইমামতি করলেন। এ রাত্রে সমস্ত নবী নামাযে তার ইকতিদা করলেন। এরপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাকে বলেনঃ "যে বুড়িকে আপনি পথের ধারে দেখেছিলেন, তাকে যেন এজন্যেই দেখানো হয়েছিল যে, দুনিয়ার বয়স ততটুকুই বাকী আছে যতটুকু বাকী আছে এই বুড়ীর বয়স। আর যে শব্দের দিকে আপনি মনোযোগ দিয়েছিলেন সে ছিল আল্লাহর শত্রু ইবলীস, যাদের সালামের শব্দ আপনার কাছে পৌঁছেছিল তারা ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা আঃ)।"[5]

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে য়ে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "যখন আমি হযরত জিবরাঈলের (আঃ) সাথে বুরাকে চলি তখন এক জায়গায় তিনি আমাকে বলেনঃ "এখানে নেমে নামায আদায় করে নিন।" নামায শেষে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এটা কোন জায়গা তা জানেন কি?" আমি উত্তরে বললামঃ না। তিনি বলেনঃ "এটা তায়্যেবা অর্থাৎ মদীনা । এটাই হচ্ছে হিজরতের জায়গা।" তারপর তিনি আমাকে আর এক জায়গায় নামায পড়ান এবংবলেনঃ "এটা হচ্ছে তূরে সাইনা"। এখানে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসার (আঃ) সাথে কথা বলেন।" তারপর তিনি

[5] এবর্ণনাতেও গারাবাত (অস্বাভাবিকতা) ও নাকারাত বা অস্বীকৃতি রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানই সবচেয়ে বেশী।

আমাকে আর এক স্থানে নামায পড়ান ও বলেনঃ “এটা হলো বায়তে লাহাম। এখানে হযরত ঈসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। এরপর আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌছি। সেখানে সমস্ত নবী একত্রিত হন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে ইমাম নির্বাচন করেন। আমি তাঁদের ইমামতি করি। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে আকাশে উঠে যান।” এরপর তার এক এক আকাশে পৌছা এবং বিভিন্ন আকাশে বিভিন্ন নবীদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ “যখন আমি সিদরাতুল মুনতাহায় পৌছলাম তখন আমাকে একটি নূরানী মেঘে ঢেকে নেয়। তখনই আমি সিজদায় পড়ে গেলাম”। তারপর তার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়া এবং পরে কমে যাওয়া ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। শেষে হযরত মুসার (আঃ) বর্ণনায় রয়েছেঃ “আমার উন্মতের উপর তো মাত্র দু'ওয়াক্ত নামায নির্ধারণ করা হয়েছিল, কিন্তু ওটাও তারা পালন করে নাই।” তার এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) পাঁচ ওয়াক্ত হতে আরো কমাবার জন্যে গেলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বললেনঃ “আমি তো আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার দিনই তোমার উপর ও তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে রেখেছিলাম। এটা পড়তে পাঁচ ওয়াক্ত, কিন্তু সওয়াব হবে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। সুতরাং তুমি ও তোমার উম্মত যেন এর রক্ষণাবেক্ষণ কর।” আমার তখন দৃঢ় প্রত্যয় হলো যে, এটাই আল্লাহ তা’আলার শেষ হুকুম। অতঃপর আবার যখন আমি হযরত মুসার (আঃ) কাছে পৌঁছলাম তখন আবার তিনি আমাকে আল্লাহ তা’আলার নিকট ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হিসেবে এটাই ছিল আল্লাহ তা’আলার অকাট্য হুকুম, তাই আমি আর তাঁর কাছে ফিরে গেলাম না।”

মুসনাদে ইবনু আবি হাতিমেও মি'রাজের ঘটনাটির সুদীর্ঘ হাদীস রয়েছে। তাতে এও রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদের পার্শ্বে এ দরজার কাছে পৌঁছেন যাকে 'বাবে মুহাম্মদ (সাঃ) বলা হয়, ওখানে একটি পাথর ছিল যাতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) অঙ্গুলি লাগিয়েছিলেন, তখন তাতে ছিদ্র হয়ে যায়। সেখানে তিনি বুরাকটি বাধেন এবং এর পর মসজিদে প্রবেশ করেন। মসজিদের মধ্যভাগে পৌঁছলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাকে বলেনঃ “আপনি কি আল্লাহ তাআলার কাছে এই আকাংখা করছেন যে, তিনি আপনাকে হুর দেখাবেন?” উত্তরে তিনি বলেন, “হ্যা” তিনি তখন বলেনঃ “তা হলে আসুন। এই যে তারা। তাদেরকে সালাম করুন।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তারা সাখরার বাম পার্শ্বে বসেছিল। আমি তাদের কাছে গিয়ে সালাম করলাম। সবাই সালামের জবাব দিলো। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ তোমরা কে? উত্তরে তারা বললোঃ “আমরা হলাম চরিত্রবতী সুন্দরী হুর। আল্লাহর পরহেযগার ও নেককার বান্দাদের আমরা স্ত্রী। যারা পাপকার্য থেকে দূরে থাকে এবং যাদেরকে পবিত্র করে আমাদের কাছে আনয়ন করা হবে। অতঃপর আর তারা কখনো বের হবে না। তারা সদা আমাদের কাছেই অবস্থান করবে।

আমাদের থেকে কখনো তারা পৃথক হবে না। চিরকাল তারা জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যু বরণ করবেনা।” অতঃপর আমি তাদের নিকট থেকে চলে আসলাম। সেখানে মানুষ জমা হতে শুরু করলো এবং অল্পক্ষণের মধ্যে বহু লোক জমা হয়ে গেল এবং আমরা সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম। ইমামতি কে করবেন এজন্যে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমার হাত ধরে সামনে বাড়িয়ে দিলেন। আমি তাদেরকে নামায পড়ালাম। নামায শেষে হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “যাদের আপনি ইমামতি করলেন তারা কে তা জানেন কি? আমি জবাব দিলামঃ না। তখন তিনি বললেনঃ “আপনার এই সব মুকতাদী ছিলেন আল্লাহর নবী যাদেরকে তিনি প্রেরণ করেছিলেন।” তারপর তিনি আমার হাত ধরে আসমানের দিকে নিয়ে চললেন।” এরপর বর্ণনা আছে যে, আকাশের দরজাগুলি খুলিয়ে দেয়া হয়। ফেরেশতাগণ প্রশ্ন করেন, উত্তর পান, দরজা খুলে দেন ইত্যাদি। প্রথম আকাশে হযরত আদমের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেনঃ “হে আমার উত্তম পুত্র! হে উত্তম নবী (সঃ)! আপনার আগমন শুভ হোক” এতে চতুর্থ আকাশে হযরত ইদরীসের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হওয়ারও উল্লেখ রয়েছে। সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হওয়া এবং হযরত আদমের (আঃ) মত তারও তাকে উত্তম পুত্র ও উত্তম নবী (সঃ) বলে সম্ভাষণ জানানোর বর্ণনা রয়েছে। তারপর আমাকে (নবী সঃ কে) হযরত জিবরাঈল (আঃ) আরো উপরে নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ “আমি একটি নদী দেখলাম। যাতে মণিমুক্তা, ইয়াকূত ও যবরজদের পানপাত্র ছিল এবং উত্তম ও সুন্দর রঙ-এর পাখী ছিল। আমি বললামঃ এতো খুবই সুন্দর পাখী! আমার একথার জবাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ “এটা যারা খাবে তারা আরো উত্তম।” অতঃপর তিনি বললেনঃ “এটা কোন নহর তা জানেন কি?” আমি জবাব দিলামঃ “না”। তিনি তখন বললেনঃ “এটা হচ্ছে নহরে কাওসার। এটা আল্লাহ তা’আলা আপনাকে দান করার জন্য রেখেছেন।” তাতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পানপাত্র ছিল যাতে ইয়াকূত ও মণিমাণিক্য জড়ানো ছিল। ওর পানি ছিল দুধের চেয়েও বেশী সাদা। আমি একটি সোনার পেয়ালা নিয়ে তা এ পানি দ্বারা পূর্ণ করে পান করলাম। এ পানি ছিল মধুর চেয়েও বেশী মিষ্ট এবং মিশক আম্বারের চেয়েও বেশী সুগন্ধময়। আমি যখন এর চেয়েও আরো উপরে উঠলাম তখন এক অত্যন্ত সুন্দর রঙ-এর মেঘ এসে আমাকে ঘিরে নিলো, যাতে বিভিন্ন রঙ ছিল। জিবরাঈল (আঃ) তো আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং আমি আল্লাহ তা’আলার সামনে সিজদায় পড়ে গেলাম।” অতঃপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। তারপর তিনি ফিরে আসেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তো কিছুই বললেন না। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) নামায হালকা করাবার জন্যে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আল্লাহ তা’আলার নিকট ফিরিয়ে পাঠালেন। মোট কথা, অনুরূপভাবে তাঁর মহান আল্লাহর কাছে বারবার যাওয়া, মেঘের মধ্যে পরিবেষ্টিত হওয়া, নামাযের ওয়াক্ত হালকা হয়ে যাওয়া, হযরত ইবরাহীমের (আঃ) সাথে

মিলিত হওয়া, হযরত মুসার (আঃ) ঘটনার বর্ণনা দেয়া, শেষ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায থেকে যাওয়া ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ “এরপর হযরত জিবারাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে নীচে অবতরণ করেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ যে সব আকাশে আমি গিয়েছি সেখানকার ফেরেশতাগণ আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং হাসিমুখে আমার সাথে মিলিত হয়েছেন। কিন্তু শুধুমাত্র একজন ফেরেশতা হাসেন নাই। তিনি আমার সালামের জবাব দিয়েছেন এবং মারহাবা বলে অভ্যর্থনাও জানিয়েছেন বটে, কিন্তু তার মুখে আমি হাসি দেখি নাই। তিনি কে?” আর তার না হাসার কারণই বা কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ “তার নাম মা’লিক। তিনি জাহান্নামের দারোগা। জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি কোন হাস্য করেন নাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত হাসবেনও না। কারণ তার খুশীর এটাই ছিল একটা বড় সময়।” ফিরবার পথে আমি কুরায়েশের এক যাত্রী দলকে খাদ্য সম্ভার নিয়ে যেতে দেখলাম। তাদের সাথে এমন একটি উট দেখলাম যার উপর একটি সাদা ও একটি কালো চটের বস্তা ছিল। যখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) এবং আমি ওর নিকটবর্তী হলাম তখন সে ভয় পেয়ে পড়ে গেল এবং এর ফলে সে খোঁড়া হয়ে গেল। এভাবে আমাকে আমার স্বস্থানে পৌঁছিয়ে দেয়া হলো।” সকালে তিনি জনগণের সামনে মে'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। মুশরিকরা এ খবর শুনে সরাসরি হযরত আবু বকরের (রাঃ) নিকট গমন করলো এবং তাকে বললোঃ “তোমার সঙ্গী কি বলছে শুনেছো কি? সে নাকি আজ রাত্রেই একমাসের পথ ভ্রমণ করে এসেছে!" উত্তরে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ “যদি প্রকৃতই তিনি একথা বলে থাকেন তবে তিনি সত্য কথাই বলছেন। এর চেয়ে আরো বড় কথা বললেও তো আমরা তাকে সতাবাদী বলেই জানবো । আমরা জানি যে, তার কাছে মাঝে মাঝে আকাশের খবর এসে থাকে।

মুশরিকরা রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বললোঃ “তুমি আমাদের কাছে তোমার সত্যবাদিতার কোন প্রমাণ পেশ করতে পার কি?” তিনি জবাবে বললেনঃ “হা, পারি। আমি অমুক অমুক জায়গায় কুরায়েশদের যাত্রীদলকে দেখেছি। তাদের একটি উট, যার উপর সাদা ও কালো দু'টি বস্তা ছিল, আমাদেরকে দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং চক্কর খেয়ে পড়ে যায়, ফলে তার পা ভেঙ্গে যায়।” এ যাত্রীদল আগমন করলে জনগণ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেঃ “পথে নতুন কিছু ঘটে ছিল কি?” তারা উত্তরে বললোঃ “হা, ঘটেছিল। অমুক উট উমুক জায়গায় এইভাবে খোঁড়া হয়ে যায় ইত্যাদি” বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মি'রাজের ঘটনাকে সত্য বলে স্বীকার করার কারণেও হযরত আবু বকরের (রাঃ) উপাধি হয় সিদ্দীক। জনগণ রাসূলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস করেঃ “আপনি তো হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসার (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, সুতরাং তাদের আকৃতির বর্ণনা

দিন তো?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "হা বলছি। হযরত মূসা (আঃ) গোধুম বর্ণের লোক, যেমন ইয্দে আম্মানের লোক হয়ে থাকে। আর হযরত ঈসার (আঃ) অবয়ব মধ্যম ধরণের এবং রঙ ছিল কিছুটা লালিমা যুক্ত। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যে, তার চুল দিয়ে যেন পানি ঝরে পড়ছে।"[6]

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শুয়ে ছিলেন কা'বা শরীফের হাতীম' নামক স্থানে। অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, তিনি সখরের উপর শুয়েছিলেন। এমন সময় আগমনকারীরা আগমন করেন। একজন অপরজনকে আদেশ করেন এবং তিনি তার কাছে এসে এখান থেকে এখান পর্যন্ত বিদীর্ণ করে দেন অর্থাৎ গলার পার্শ্ব থেকে নিয়ে নাভী পর্যন্ত। তারপর উপরে বর্ণিত হাদীসগুলির বর্ণনার মতই বর্ণিত হয়েছে।" তাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ "ষষ্ঠ আকাশে আমি হযরত মুসাকে (আঃ) সালাম করি এবং তিনি সালামের জবাব দেন। অতঃপর বলেনঃ "সৎ ভাই ও সৎ নবীর (সাঃ) আগমন শুভ হোক" আমি সেখান হতে আগে বেড়ে গেলে তিনি কেঁদে ফেলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ "আপনি কাঁদছেন কেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "এই জন্যে যে, যে ছেলেটিকে আমার পরে নবী করে পাঠান হয়েছে তার উম্মত আমার উম্মতের তুলনায় অধিক সংখ্যক জান্নাতে যাবে।" তাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সিদরাতুল মুনতাহার নিকট চারটি নহর দেখেন। দুটি যা'হির ও দুটি বাতিন। তিনি বলেনঃ "আমি বললামঃ হে জিবরাঈল (আঃ)! এই চারটি নহর কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ "বাতিনী নহর দু'টি হচ্ছে জান্নাতের নহর এবং যাহিরী নহর দু'টি হলো নীল ও ফুরাত।"
অতঃপর আমার সামনে "বায়তুল মা'মূর' উচু করা হলো, তারপর আমার সামনে মদ, দুধ ও মধুর পাত্র পেশ করা হলো। আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলাম। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ "এটাই হচ্ছে ফিতরত' (প্রকৃতি) যার উপর আপনি রয়েছেন ও আপনার উম্মত রয়েছে।" তাতে রয়েছে যে, যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায রয়ে গেল এবং হযরত মুসা কালীমুল্লাহ (আঃ) আবার তাকে আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যেতে বললেন তখন তিনি বললেনঃ "আমি তো এখন আমার প্রতিপালকের কাছে আবেদন করতে লজ্জা পাচ্ছি। এখন আমি সম্মত হয়ে গেলাম এবং এটাই স্বীকার করে নিলাম" অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "আমার ঘরের ছাদ খুলে দেয়া হলো। এ সময় আমি মক্কায় ছিলাম (শেষ পর্যন্ত)।" তাতে রয়েছে যে, নবী (সঃ) বলেনঃ "যখন আমি হযরত জিবরাঈলের (আঃ) সাথে দুনিয়ার আকাশে আরোহণ করলাম তখন দেখলাম যে, একটি লোক বসে রয়েছেন এবং তার ডানে ও বামে বড় বড় দল রয়েছে। ডান দিকে তাকিয়ে তিনি হেসে উঠছেন এবং বাম দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলছেন। আমি হযরত

---

[6] এই বর্ণনাতেও অস্বাভাবিকতা ও অদ্ভুত বস্তুনিচয় পরিলক্ষিত হয়।

জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলামঃ ইনি কে? আর তার ডানে ও বামে যারা রয়েছে তারা কারা?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “ইনি হলেন হযরত আদম (আঃ)। আর ওরা হলো তার সন্তান। ডান দিকের গুলো জান্নাতী এবং বাম দিকের গুলো জাহান্নামী। ওদেরকে দেখে তিনি খুশী হচ্ছেন এবং এদেরকে দেখে কেঁদে ফেলছেন।” এই রিওয়াইয়াতে আছে যে, ৬ষ্ঠ আকাশে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তাতে আছে যে, তিনি বলেনঃ “সপ্তম আকাশ হতে আমাকে আরো উপরে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সমান্তরালে পৌঁছে আমি কলমের লিখার শব্দ শুনতে পাই”।

তাতে আছে যে, নবী (সাঃ) বলেনঃ “হযরত মুসার (আঃ) পরামর্শ অনুযায়ী যখন আমি নামাযের ওয়াক্ত হালকা করাবার জন্যে আবার আল্লাহ তাআলার নিকট গমন করলাম তখন তিনি অর্ধেক মাফ করলেন। আবার গেলাম। এবারও তিনি অর্ধেক ক্ষমা করলেন, পুনরায় গেলে পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারিত হয়।”

ওতে রয়েছে যে, তিনি বলেনঃ “সিদরাতুল মুনতাহা হয়ে আমি জান্নাতে পৌঁছি যেখানে খাঁটি মণিমুক্তার তাঁবু ছিল এবং যেখানকার মাটি ছিল খাঁটি মিশক আম্বার।”[7]

হযরত শাকীক (রঃ) হযরত আবূ যারকে (রাঃ) বলেনঃ “যদি আমি রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) দেখতাম তবে কমপক্ষে তাকে একটি কথা অবশ্যই জিজ্ঞেস করতাম।” তখন হযরত আবূ যার (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “সেই কথাটি কি?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “তিনি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন কিনা এই
কথাটি।” একথা শুনে হযরত আবূ যার (রাঃ) বলেনঃ “একথা আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ “আমি তার নূর (আলো) দেখেছিলাম। তাকে আমি কিরূপে দেখতে পারি?”[8]

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ “তিনি তো নূর। সুতরাং আমি তাঁকে কি করে দেখতে পারি?”

---

[7] এই পূর্ণ হাদীসটি সহীহ্ বুখারীর কিতাবুস সালাত -এর মধ্যেও বর্ণিত হয়েছে এবং যিক্‌রে বানী ইসরাঈলের মধ্যেও আছে। ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁর সহীহ মুসলিম গ্রন্থে কিতাবুল 'ঈমান'-এর মধ্যে এটা বর্ণনা করেছেন।

[8] এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ “আমি মে'রাজের ঘটনাটি যখন জনগণের কাছে বর্ণনা করি এবং কুরায়েশরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, এ সময় আমি হাতীমে দাড়িয়েছিলাম। আল্লাহ তাআলা বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার চোখের সামনে এনে ধরলেন এবং ওটাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে দিলেন। এখন তারা যে নিদর্শনগুলি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, সেগুলির উত্তর আমি সঠিকভাবে দিয়ে যাচ্ছিলাম।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসে হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসার (আঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফিরে এসে জনগণের সামনে তিনি এ ঘটনাটি বর্ণনা করলে যারা তার সাথে নামায পড়েছিল তারা দ্বিধা দ্বন্দে পড়ে যায়। কুরায়েশ কাফিরদের দল তৎক্ষণাৎ দৌড়ে হযরত আবু বকরের (রাঃ) নিকট গমন করে এবং বলেঃ “দেখো, আজ তোমার সাথী নবী (সঃ) কি এক বিস্ময়কর কথা বলছে! বলছে যে, সে নাকি এক রাত্রেই বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছে ও ফিরে এসেছে!” একথা শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেনঃ “যদি তিনি একথা বলে থাকেন তবে সত্যিই তিনি এভাবে গিয়ে ফিরে এসেছেন।” তারা তখন বললোঃ “তাহলে তুমি এটাও বিশ্বাস করছো যে, সে রাত্রে বের হলো এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই সিরিয়া হতে মক্কায় ফিরে আসলো?” উত্তরে তিনি বললেনঃ এর চেয়েও আরো বড় ব্যাপার আমি এর বহু পূর্ব হতেই বিশ্বাস করে আসছি। অর্থাৎ আমি এটা স্বীকার করি যে, তার কাছে আকাশ হতে খবর পৌঁছে থাকে। আর ঐ সব খবর দেয়ার ব্যাপারে তিনি চরম সত্যবাদী।” এ সময় থেকেই তার উপাধি হয় আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)।[9]

হযরত যার ইবনু জায়েশ (রঃ) বলেনঃ “আমি হযরত হুযাইফার (রাঃ) নিকট (একদা) আগমন করি। ঐ সময় তিনি মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। এ বর্ণনায় তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ “আমরা চলতে থাকি, শেষ পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে যাই।” এরপর হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, তারা দু'জন (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাঃ) ও হযরত জিবরাঈল (আঃ)) ভিতরে প্রবেশ করেন নাই। একথা শোনা মাত্র আমি বললামঃ এটা ভুল কথা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ভিতরেও গিয়েছিলেন এবং ঐ রাত্রে তিনি সেখানে নামাযও পড়েছিলেন। আমার একথা শুনে হযরত হুযাইফা (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমার নাম কি? আমি তোমাকে চিনি বটে, কিন্তু নামটা আমার মনে নেই।” উত্তরে আমি বললামঃ আমার নাম যার ইবনু জায়েশ। তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেনঃ “তুমি এটা কি করে জানতে পারলে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বায়তুল

[9] এ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মুকাদ্দাসের ভিতরে গিয়েছিলেন?” জবাবে আমি বললামঃ এটা কুরআন কারীমেরই খবর। তিনি তখন বললেনঃ “কুরআন কারীম হতে যে কথা বলে সে তো মুক্তি পেয়েছে! কুরআনের কোন্ আয়াতে এটা রয়েছে, পাঠ করতো?” আমি তখন سُبْحَنَ الَّذِى ..... الخ এই আয়াতটি পাঠ করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “এই আয়াতের কোন শব্দের অর্থ এটা হলো যে, তিনি সেখানে নামায পড়েছিলেন? না, না। তিনি সেখানে নামায পড়েন নাই। যদি পড়তেন তবে তোমাদের উপর অনুরূপভাবে তথাকার নামায লিখে দেয়া হতো, যেমন ভাবে বায়তুল্লাহ শরীফের নামায লিখে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর শপথ! তাঁরা দু'জন বুরাকের উপরই ছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাদের জন্যে আকাশের দরজাগুলি খুলে দেয়া হয়। সুতরাং তারা জান্নাত ও জাহান্নাম দেখে নেন এবং আরো দেখে নেন আখেরাতের ওয়াদাকৃত অন্যান্য সমস্ত জিনিস। তারপর এভাবেই ফিরে আসেন।” এরপর তিনি খুব হাসলেন এবং বলতে লাগলেনঃ “মজার কথা তো এটাই যে, লোকেরা বলেঃ তিনি সেখানে বুরাক বাঁধেন যেন কোথাও পালিয়ে না যায়, অথচ দৃশ্য ও অদৃশ্যের খবর রাখেন যিনি সেই মহান আল্লাহ এ বুরাককে রাসূলুল্লাহর (সঃ) আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছিলেন।” আমি জিজ্ঞেস করলামঃ জনাব! বুরাক কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ “বুরাক হলো দীর্ঘ অবয়ব বিশিষ্ট সাদা রঙ-এর একটি জন্তু যা এক একটি পা এতো দূরে রাখে যত দূর দৃষ্টি যায়।”[10]

একবার সাহীবগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহকে (সঃ) মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করার আবেদন জানান। তখন প্রথমতঃ তিনি سُبْحَنَ الَّذِى ..... الخ এই আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেনঃ “এশার নামাযের পর আমি মসজিদে শুয়েছিলাম এমতাবস্থায় এক আগমনকারী আগমন করে আমাকে জাগ্রত করেন। আমি উঠে বসলাম কিন্তু কাউকেও দেখতে পেলাম না। তবে জানোয়ারের মত একটা কি দেখলাম এবং গভীর ভাবে দেখতেই থাকলাম। অতঃপর মসজিদ হতে বেরিয়ে দেখতে পেলাম যে, একটা বিস্ময়কর জন্তু দাড়িয়ে রয়েছে। আমাদের জন্তুগুলির মধ্যে খচ্চরের সঙ্গে ওর কিছুটা সাদৃশ্য ছিল। ওর কান দুটি ছিল উপরের দিকে উত্থিত ও দোদুল্যমান। ওর নাম হচ্ছে বুরাক। আমার পূর্ববর্তী নবীরাও (আঃ) এরই উপর সওয়ার হয়ে এসেছেন। আমি ওরই উপর সওয়ার হয়ে চলতেই রয়েছি এমন সময় আমার ডান দিক থেকে একজন ডাক দিয়ে বললোঃ “হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আমার দিকে তাকাও, আমি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবো।” কিন্তু আমি না জবাব দিলাম, না দাঁড়ালাম। এরপর কিছু দূর গিয়েছি এমন সময় বাম দিক থেকেও ডাকের শব্দ

---

[10] এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। তবে এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, হযরত হুযাইফার (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীসের উপর অগ্রগণ্য হচ্ছে এ হাদীসগুলি যেগুলি দ্বারা রাসুলুল্লাহর (সাঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায পড়া সাবাস্ত হয়েছে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

আসলো। কিন্তু এখানেও আমি থামলাম না এবং জবাবও দিলাম না। আবার কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দেখি যে, একটি স্ত্রীলোক দুনিয়ার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে এবং কামউদ্দীপনা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেও আমাকে বললোঃ "আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই। কিন্তু আমি তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করলাম না এবং থামলামও না।" এরপর তার বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছা, দুধের পাত্র গ্রহণ করা এবং হযরত জিবরাঈলের (আঃ) কথায় খুশী হয়ে দু'বার তাকবীর পাঠ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "আপনার চেহারায় চিন্তারভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে কেন?" (নবী. সঃ বলেনঃ) আমি তখন পথের ঘটনা দুটির কথা বর্ণনা করলাম। তিনি তখন বলতে শুরু করলেনঃ এ প্রথম লোকটি ছিল ইয়াহুদী। যদি আপনি তার কথার উত্তর দিতেন এবং সেখানে দাঁড়াতেন তবে আপনার উম্মত ইয়াহুদী হয়ে যেতো। দ্বিতীয় আহবানকারী ছিল খৃষ্টান। যদি আপনি সেখানে থেমে তার সাথে কথা বলতেন তবে আপনার উম্মত খৃষ্টান হয়ে যেতো। আর এ স্ত্রী লোকটি ছিল দুনিয়া। যদি আপনি সেখানে থেমে তার সাথে কথা বলতেন তবে আপনার উম্মত আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো।" রসূলুল্লাহ সঃ বলেনঃ অতঃপর আমি এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলাম এবং দু'জনই দু'রাকাত করে নামায আদায় করলাম। তারপর আমাদের সামনে মি'রাজ (আরোহণের সিঁড়ি) হাজির করা হলো যাতে চড়ে বানী আদমের আত্মাসমূহ উপরে উঠে থাকে। দুনিয়া এইরূপ সুন্দর জিনিস আর কখনো দেখে নাই। তোমরা কি দেখ না যে, মরণোন্মূখ ব্যক্তির চক্ষু মরণের সময় আকাশের দিকে উঠে থাকে? এটা দেখে বিস্মিত হয়েই সে এরূপ করে থাকে। আমরা দু'জন উপরে উঠে গেলাম। আমি ইসমাঈল নামক ফেরেশতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি দুনিয়ার আকাশের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। তার অধীনে সত্তর হাজার ফেরেশতা রয়েছেন। তাদের মধ্যে প্রত্যেক ফেরেশতার সঙ্গীয় লশকরী ফেরেশতাদের সংখ্যা হলো এক লাখ। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমার প্রতিপালকের লশকরদেরকে শুধুমাত্র তিনিই জানেন।" হযরত জিবরাঈল (আঃ) এ আকাশের দরজা খুলতে বললে জিজ্ঞেস করা হলোঃ "কে?" তিনি উত্তর দিলেনঃ "জিবরাঈল (আঃ)। প্রশ্ন করা হলোঃ "আর কে আছেন?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "হযরত মুহাম্মদ (সঃ)।" পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলোঃ আপনাকে কি তার নিকট পাঠানো হয়েছিল?" তিনি জবাব দিলেন "হা"। সেখানে আমি হযরত আদমকে (আঃ) ঐ আকৃতিতে দেখলাম যে আকৃতিতে ঐ দিন ছিলেন যেই দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সামনে তার সন্তানদের আত্মাগুলি পেশ করা হয়। সৎ লোকদের আত্মা গুলি দেখে তিনি বলেনঃ "আত্মাও পবিত্র এবং দেহও পবিত্র। একে ইল্লীনে নিয়ে যাও।" আর অসৎ লোকদের আত্মাগুলি দেখে বলেনঃ আত্মাও অপবিত্র এবং দেহও অপবিত্র। একে সিজ্জীনে নিয়ে যাও।" কিছু দূর গিয়ে দেখি যে, একটি খাঞ্চা রাখা আছে এবং তাতে অত্যন্ত উত্তম ভাজা গোশত

রয়েছে আর এক দিকে রয়েছে আর একটি খাঞ্চা। তাতে আছে পঁচা দূর্গন্ধময় ভাজা গোশত। এমন কতকগুলি লোককে দেখলাম যারা উত্তম গোশতের কাছেও যাচ্ছে না। এবং এ পঁচা দুর্গন্ধময় ভাজা গোশত খেতে রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ "হে জিবরাঈল (আঃ)! এই লোকগুলি কারা?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "এরা হলো আপনার উম্মতের ঐ সব লোক যারা হালাল কে ছেড়ে হারামের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে।" আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দেখি যে, কতকগুলি লোকের ঠোঁট উটের মত। ফেরেশতারা তাদের মুখ ফেড়ে ফেড়ে ঐ গোশত তাদের মুখের মধ্যে ভরে দিচ্ছেন যা তাদের অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারা ভীষণ চীৎকার করছে এবং মহান আল্লাহর সামনে মিনতি করতে রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ "এরা কারা?" জবাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ "এরা আপনার উম্মতের ঐসব লোক যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতো। যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে খায় তারা নিজেদের পেটের মধ্যে আগুন ভরে দিচ্ছে এবং অবশ্য অবশ্যই তারা জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করবে।" আরো কিছু দূর গিয়ে দেখি যে, কতকগুলি স্ত্রী লোক নিজেদের বুকের ভরে লটকানো রয়েছে এবং হায়! হায়! করতে আছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ "এরা হচ্ছে আপনার উম্মতের ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক।" আর একটু অগ্রসর হয়ে দেখি যে, কতকগুলি লোকের পেট বড় বড় ঘরের মত। যখন উঠতে চাচ্ছে তখন পড়ে যাচ্ছে এবং বার বার বলতে আছেঃ "হে আল্লাহ! কিয়ামত যেন সংঘটিত না হয়।" ফিরআউনী জন্তুগুলি দ্বারা তারা পদদলিত হচ্ছে। আর তারা আল্লাহ তাআলার সামনে হা-হুতাশ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ এরা কারা? জবাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ এরা হচ্ছে আপনার উম্মতের ঐ সব লোক যারা সুদ খেতো। সুদখোররা এ লোকদের মতই দাঁড়াবে যাদেরকে শয়তান পাগল করে রেখেছে।" আরো কিছু দূর গিয়ে দেখি যে, কতকগুলি লোকের পার্শ্বদেশের গোশত কেটে কেটে ফেরেশতাগণ তাদেরকে খাওয়াচ্ছেন। আর তাদেরকে তারা বলতে আছেন, "যেমন তোমরা তোমাদের জীবদ্দশায় তোমাদের ভাইদের গোশত খেতে তেমনই এখনো খেতে থাকো।" আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে জিবরাঈল (আঃ)! এরা কারা? উত্তরে তিনি বললেনঃ "এরা হচ্ছে আপনার উম্মতের ঐ সব লোক যারা অপরের দোষ অন্বেষণ করে বেড়াতো।"

এরপর আমরা দ্বিতীয় আকাশে আরোহণ করলাম। সেখানে আমি একজন অত্যন্ত সুদর্শন লোককে দেখলাম। তিনি সুদর্শন লোকদের মধ্যে ঐ মর্যাদাই রাখেন যেমন মর্যাদা রয়েছে চন্দ্রের তারকারাজির উপর। জিজ্ঞেস করলামঃ ইনি কে? জবাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ "ইনি হলেন আপনার ভাই ইউসুফ (আঃ)" তার সাথে তার কওমের কিছু লোক রয়েছে। আমি তাদেরকে সালাম করলাম এবং তারা আমার সালামের জবাব দিলেন। তারপর আমরা তৃতীয়

আকাশে আরোহণ করলাম। আকাশের দরজা খুলে দেয়া হলো। সেখানে আমি হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) ও হযরত যাকারিয়াকে (আঃ) দেখলাম। তাদের সাথে তাদের কওমের কিছু লোক ছিল। আমি তাদেরকে সালাম করলাম এবং তারা আমার সালামের উত্তর দিলেন। এরপর আমরা চতুর্থ আকাশে উঠলাম। সেখানে হযরত ইদ্রীসকে (আঃ) দেখলাম। আল্লাহ তাআলা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন। অতঃপর আমরা পঞ্চম আকাশে আরোহণ করলাম। সেখানে ছিলেন হযরত হারূণ (আঃ)। তার শ্মশ্রুর অর্ধেকটা সাদা ছিল এবং অর্ধেকটা কালো ছিল। তার শ্মশ্রু ছিল অত্যন্ত লম্বা, তা প্রায় নাভী পর্যন্ত লটকে গিয়েছিল। আমার প্রশ্নের উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ “ইনি হচ্ছেন তার কওমের মধ্যে হৃদয়বান ব্যক্তি হযরত হারূণ ইবনু ইমরান (আঃ)। তার সাথে তার কওমের একদল লোক ছিল। তারাও আমার সালামের উত্তর দেন। তারপর আমরা আরোহণ করলাম ষষ্ঠ আকাশে। সেখানে আমার সাক্ষাৎ হলো হযরত মুসা ইবনু ইমরানের (আঃ) সঙ্গে। তিনি গোধুম বর্ণের লোক ছিলেন। তার চুল ছিল খুবই বেশী। দু'টো জামা পরলেও চুল তা ছড়িয়ে যেতো। মানুষ বলে থাকে যে, আল্লাহ তাআলার কাছে আমার বড় মর্যাদা রয়েছে, অথচ দেখি যে, এঁর মর্যাদা আমার চেয়েও বেশী। আমি হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে, ইনি হচ্ছেন হযরত মুসা ইবনু ইমরান (আঃ)। তাঁর পার্শ্বেও তার কওমের কিছু লোক ছিল। তিনিও আমার সালামের জবাব দিলেন। তারপর আমরা সপ্তম আকাশে উঠলাম। সেখানে আমি আমার পিতা হযরত ইবরাহীম খলীলকে (আঃ) দেখলাম। তিনি স্বীয় পৃষ্ঠ বায়তুল মা"মূরে লাগিয়ে দিয়ে বসে রয়েছেন। তিনি অত্যন্ত ভাল মানুষ। জিজ্ঞেস করে আমি তার নামও জানতে পারলাম। আমি সালাম করলাম এবং তিনি জবাব দিলেন। আমি আমার উম্মতকে দু'ভাগে বিভক্ত দেখলাম। অর্ধেকের কাপড় ছিল বকের মত সাদা এবং বাকী অর্ধেকের কাপড় ছিল অত্যন্ত কালো। আমি বায়তুল মা’মুরে গেলাম। সাদা পোশাক যুক্ত লোকগুলি সবাই আমার সাথে গেল এবং কালো পোশাকধারী লোকদেরকে আমার সাথে যেতে দেয়া হলো না। আমরা সবাই সেখানে নামায পড়লাম। তারপর সবাই সেখান হতে বেরিয়ে আসলাম। এই বায়তুল মা’মুরেই প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা নামায পড়ে থাকেন। কিন্তু যারা একদিন নামায পড়েছেন তাদের পালা কিয়ামত পর্যন্ত আসবে না। অতঃপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় উঠিয়ে নেয়া হলো। যার প্রত্যেকটি পাতা এতো বড় যে, আমার সমস্ত উম্মতকে ঢেকে ফেলবে।” তাতে একটি নহর প্রবাহিত ছিল যার নাম সালসাবীল। এর থেকে দুটি প্রস্রবণ বের হয়েছে। একটি হলো নহর কাওসার এবং আর একটি নহরে রহমত। আমি তাতে গোসল করলাম। আমার পূর্বাপর সমস্ত পাপ মোচন হয়ে গেল। এরপর আমাকে জান্নাতের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে আমি একটি হুর দেখলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ তুমি কার? উত্তরে সে বললোঃ “আমি হলাম

হযরত যায়েদ ইবনু হারেসার (রাঃ)। সেখানে আমি নষ্ট না হওয়া পানি, স্বাদ পরিবর্তন না হওয়া দুধ, নেশাহীন সুস্বাদু মদ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মধুর নহর দেখলাম। ওর ডালিম ফল বড় বড় বাল্‌তির সমান ছিল। ওর পাখী ছিল তোমাদের এই তক্তা ও কাঠের ফালির মত। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার সৎবান্দাদের জন্যে এ সব নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন যা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোন অন্তরে কল্পনাও জাগে নাই। অতঃপর আমার সামনে জাহান্নাম পেশ করা হলো, যেখানে ছিল আল্লাহ তাআলার ক্রোধ, তাঁর শাস্তি এবং তার অসন্তুষ্টি। যদি তাতে পাথর ও লোহ নিক্ষেপ করা হয় তবে ওগুলিকেও খেয়ে ফেলবে। এরপর আমার সামনে থেকে ওটা বন্ধ করে দেয়া হলো। আবার আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছিয়ে দেয়া হলো এবং ওটা আমাকে ঢেকে ফেললো । এখন আমার মধ্যে এবং তার হযরত জিবরাঈলের (আঃ) মধ্যে মাত্র দু'টি কামান পরিমাণ দূরত্ব থাকলো, এমনকি এর চেয়েও নিকটবর্তী, প্রত্যেক পাতার উপর ফেরেশতা এসে গেলেন। এবং আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হলো। আর আমাকে বলা হলোঃ “তোমার জন্যে প্রত্যেক ভাল কাজের বিনিময়ে দশটি পূণ্য রইলো। তুমি যখন কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করবে, অথচ তা পালন করবে না, তথাপি একটি পূণ্য লিখা হবে। আর যদি করেও ফেল তবে দশটি পূর্ণ লিপিবদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে যদি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা কর, কিন্তু তা না কর তবে একটিও পাপ লিখা হবে না। আর যদি করে বস তবে মাত্র একটি পাপ লিখা হবে।” তারপর হযরত মুসার (আঃ) নিকট আগমন করা এবং তাঁর পরামর্শক্রমে বারবার আল্লাহ তাআলার নিকট গমন করা এবং নামাযের ওয়াক্তের সংখ্যা কম হওয়ার বর্ণনা রয়েছে, যেমন ইতিপূর্বে গত হয়েছে। শেষে যখন পাঁচ ওয়াক্ত বাকী থাকলো তখন ফেরেশতার মাধ্যমে ঘোষণা করা হলোঃ “আমার ফরজ পূর্ণ হয়ে গেল এবং আমি আমার বান্দার উপর হাল্কা করলাম। তাকে প্রত্যেক সৎ কাজের বিনিময়ে দশটি পুণ্য দান করা হবে।” এর পরেও হযরত মূসা (আঃ) আমাকে আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু আমি বললামঃ “এখন আমার আবারও যেতে লজ্জা লাগছে। অতঃপর সকালে তিনি জনগণের সামনে এই সব বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তিনি এ রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছেছেন, তাকে আকাশ সমূহে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তিনি এটা, ওটা দেখেছেন। তখন আবূ জেহেল ইবনু হিশাম বলতে শুরু করেঃ “আরে দেখো, বিস্ময়কর কথা শুনো! আমরা উটকে মেরে পিটেও দীর্ঘ এক মাসে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে থাকি।, আবার ফিরে আসতেও এক মাস লেগে যায়, আর এ বলছে যে, সে দু'মাসের পথ এক রাত্রেই অতিক্রম করেছে!” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বললেনঃ “শুনো, যাওয়ার সময় আমি তোমাদের যাত্রীদলকে অমুক জায়গায় দেখেছিলাম। অমুক রয়েছে অমুক রঙ এর উটের উপর এবং তার কাছে রয়েছে এইসব আসবাবপত্র।” আবু জেহেল তখন বললোঃ খবর তো তুমি দিলে, দেখা

যাক, কি হয়?” তখন তাদের মধ্যে একজন বললোঃ “আমি বায়তুল মুকাদ্দাসের অবস্থা তোমাদের চাইতে বেশী জানি, ওর ইমারত, ওর আকৃতি, পাহাড় হতে ওটা কাছাকাছি হওয়া ইত্যাদি সবই আমার জানা আছে।” সুতরাং আল্লাহ তা’আলা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) চোখের সামনে হতে পর্দা সরিয়ে ফেললেন এবং যেমন আমার ঘরে বসে বসে জিনিসগুলি দেখে থাকি, অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সামনে বায়তুল মুকাদ্দাসকে হাজির করে দেয়া হলো। তিনি বলতে লাগলেনঃ “ওর গঠনাকৃতি এই প্রকারের, ওর আকার এইরূপ এবং ওটা পাহাড় থেকে এই পরিমাণ নিকটে রয়েছে ইত্যাদি।” এ লোকটি একথা শুনে বললোঃ “নিশ্চয়ই আপনি সত্য কথাই বলছেন।” অতঃপর সে কাফিরদের সমাবেশের দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে বললোঃ “মুহাম্মদ (সঃ) নিজের কথায় সত্যবাদী” কিংবা এই ধরনের কোন একটা কথা বলেছিলেন।[11]

এই রিওয়াইয়াতটি আরো বহু গ্রন্থে রয়েছে। এর স্বাভাবিকতা, অস্বীকৃতি এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও আমরা এটা বর্ণনা করলাম, এর কারণ এই যে, এতে আরো বহু হাদীসের গ্রন্থের প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। আর এজন্যেও যে, ইমাম বায়হাকীর (রঃ) হাদীস গ্রন্থে রয়েছেঃ হযরত আবুল আযহার ইয়াযীদ ইবনু আবি হাকীম (রঃ) বলেনঃ “একদা স্বপ্নে আমি রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) দেখতে পাই। তাকে আমি জিজ্ঞেস করিঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার উম্মতের মধ্যে এমন একটি লোক রয়েছেন যাঁকে সুফ্ইয়ান ছাওরী (রঃ) বলা হয়, তার মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি তো নেই? উত্তরে তিনি বলেনঃ “না, তার মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি নেই।” আমি আরো বর্ণনাকারীদের নাম বর্ণনা করে জিজ্ঞেস করলামঃ তারা আপনার হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, আপনি বলেছেনঃ “এক রাত্রে আপনার মি'রাজ হয় এবং আপনি আকাশে দেখেছেন (শেষ পর্যন্ত)”? তিনি উত্তরে বললেনঃ “হা, এটা ঠিক কথাই বটে।” আবার আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার উম্মতের কতকগুলি লোক আপনার মে'রাজের ঘটনায় অনেক বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক কথা বর্ণনা করে থাকে। তিনি বললেনঃ “হা এগুলো হচ্ছে কাহিনী কথকদের কথা ।”

হযরত শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) বলেনঃ “আমরা নবীকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহ্র রাস্ল (সাঃ)! দয়া করে আমাদের সামনে আপনার মি'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করবেন কি”? উত্তরে তিনি বললেনঃ “তা হলে শুনো! আমি আমার সাহাবীদেরকে নিয়ে মক্কায় এশার নামায দেরীতে পড়লাম। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে সাদা রঙ-এর একটি জন্তু আনয়ন

---

[11] এই বর্ণনাটি হাফিয আবূ বকর বায়হাকীর (রঃ) “কিতাবু দালায়িলিন্ নুবওয়াহ' নামক গ্রন্থে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে।

করেন, যা গাধার চেয়ে উচু ও খচ্চরের চেয়ে নীচু। এরপর আমাকে বলেনঃ “এর উপর আরোহণ করুন!” জন্তুটি একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) ওর কানটি ধরে মুচড়িয়ে দেন। তখনই সে শান্ত হয়ে যায়। আমি তখন ওর উপর সওয়ার হয়ে যাই।”এতে মদীনায় নামায পড়া, পরে মাদইয়ানে এ বৃক্ষটির পাশে নামায পড়ার কথা বর্ণিত আছে যেখানে হযরত মূসা (আঃ) থেমেছিলেন। তারপর বায়তে লাহামে নামায পড়ার বর্ণনা রয়েছে যেখানে হযরত ঈসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এরপর বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায পড়ার কথা রয়েছে। সেখানে পিপাসার্ত হওয়া, দুধ ও মধুর পাত্র হাজির হওয়া এবং পেট পুরে দুধ পান করার কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেনঃ “সেখানে একজন বৃদ্ধ লোক হেলান লাগিয়ে বসে ছিলেন যিনি বললেন যে, ইনি ফিতরত (প্রকৃতি) পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন এবং সুপথ প্রাপ্ত হয়েছেন। অতঃপর আমরা একটি উপত্যকায় আসলাম। সেখানে আমি জাহান্নামকে দেখলাম যা জ্বলন্ত অগ্নির আকারে ছিল। তারপর ফিরবার পথে অমুক জায়গায় আমি কুরায়েশদের যাত্রী দলকে দেখলাম যারা তাদের একটি হারানো উট খোঁজ করছিল। আমি তাদেরকে সালাম করলাম। তাদের কতক লোক আমার কণ্ঠস্বর চিনেও ফেললো এবং পরস্পর বলাবলি করতে লাগলোঃ “এটা তো একেবারে মুহম্মদের (সাঃ) কণ্ঠস্বর।” অতঃপর সকালের পূর্বেই আমি মক্কায় আমার সহচরবৃন্দের কাছে পৌঁছে গেলাম। আমার কাছে হযরত আবূ বকর (রাঃ) আসলেন এবং বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)! আজ রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন? যেখানে যেখানে আমার ধারণা হয়েছে সেখানে সেখানে আমি আপনাকে খোঁজ করেছি, কিন্তু কোথাও খুঁজে পাই নাই।” আমি বললামঃ আজ রাত্রে তো আমি বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছি ও ফিরে এসেছি।” তিনি বললেনঃ “বায়তুল মুকাদ্দাস তো এখান থেকে এক মাসের পথের ব্যবধানে রয়েছে। আচ্ছা সেখানকার কিছু নিদর্শন বর্ণনা করুন তো।” তৎক্ষণাৎ ওটাকে আমার সামনে করে দেয়া হয়, যেন আমি ওটা দেখছি। এখন আমাকে যা কিছু প্রশ্ন করা হয়, আমি দেখে তার উত্তর দিয়ে দিই। তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেনঃ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর সত্যবাদী রাসূল (সঃ)।” কিন্তু কুরায়েশ কাফিররা বিদ্রুপ করে বলে বেড়াতে লাগলোঃ “দেখো, ইবনু আবি কাবশা' (সঃ) বলে বেড়াচ্ছে যে, সে এক রাত্রেই বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে ফিরে এসেছে।” আমি বললামঃ শুনো! আমি তোমাদের কাছে এর একটা প্রমাণ পেশ করছি। তোমাদের যাত্রীদলকে আমি অমুক জায়গায় দেখে এসেছি। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল, যা অমুক ব্যক্তি নিয়ে এসেছে। এখন তারা এতোটা ব্যবধানে রয়েছে। এক মনযিল হবে তাদের অমুক জায়গা, দ্বিতীয় মনযিল হবে অমুক জায়গা এবং অমুক দিন তারা এখানে পৌঁছে যাবে। এ যাত্রী দলের সাথে সর্বপ্রথমে একটি গোধূম বর্নের উট রয়েছে। ওর উপর পড়ে রয়েছে একটি কালো ঝুল এবং আসবাবপত্রের দুটি কালো বস্তা ওর দুদিকে বোঝাই করা আছে।” এ যাত্রী দলের মক্কায় আগমনের যে দিনের কথা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, এ দিন যখন আসলো তখন দুপুরের সময় লোকেরা দৌড়িয়ে শহরের বাইরে গেল যে, দেখা যাক, তার কথা কতদূর সত্য? তারা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো যে, যাত্রীদল আসছে এবং সত্য সত্যই এ উটটিই আগে রয়েছে।[12]

হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মি'রাজের রাত্রে যখন জান্নাতে তশরীফ আনেন তখন একদিক হতে পায়ের চাপের শব্দ শোনা যায়। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "হে জিবরাঈল (আঃ)! এটা কে?" উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ "ইনি হচ্ছেন মুআযযিন হযরত বিলাল (রাঃ)।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মি'রাজ হতে ফিরে এসে বলেনঃ "হে বিলাল (রাঃ)! তুমি মুক্তি পেয়ে গেছ। আমি এরূপ এরূপ দেখেছি।" তাতে রয়েছে যে, সাক্ষাতের সময় হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ "নবী উম্মীর (সঃ) আগমন শুভ হোক।" হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন গোধূম বর্ণের দীর্ঘ অবয়ব বিশিষ্ট লোক। তার মাথার চুল ছিল কান পর্যন্ত অথবা কান হতে কিছুটা উচু। এতে আছে যে, প্রত্যেক নবী প্রথমে রাসূলুল্লাহকে (সঃ) সালাম দিয়েছিলেন। জাহান্নাম পরিদর্শনের সময় তিনি কতকগুলি লোককে দেখতে পান যে, তারা মৃতদেহ ভক্ষণ করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "এরা কারা?" হযরত জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দিলেনঃ "যারা লোকদের গোশত ভক্ষণ করতো অর্থাৎ গীবত করতো ।" সেখানেই তিনি একটি লোককে দেখতে পেলেন যে, স্বয়ং আগুনের মত লাল ছিল এবং চোখ ছিল বাকা ও টেরা। তিনি প্রশ্ন করলেনঃ "এটা কে?"উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ "এটাই হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে হযরত সালেহের (আঃ) উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল।

মুসনাদে আহমদে রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছিয়ে দিয়ে সেখান থেকে ফিরিয়ে এনে একই রাত্রে মক্কা শরীফে পৌঁছিয়ে দেন এবং এই খবর তিনি জনগণের মধ্যে প্রচার করেন, বায়তুল মুকাদ্দাসের নিদর্শনগুলি বলে দেন, তাদের যাত্রী দলের খবর প্রদান করেন তখন কতকগুলি লোক বললোঃ "এ সব কথায় আমরা তাকে সত্যবাদী মনে করি না।" একথা বলে তারা ইসলাম ধর্ম থেকে ফিরে যায়। এরা সবাই আবূ জেহেলের সাথে নিহত হয়। আবূ জেহেল বলতে শুরু করেঃ "এই লোকটি নবী (সঃ) আমাদের যাককূম গাছের ভয় দেখাচ্ছে। খেজুর ও মাখন নিয়ে এসো এবং এ দু'টোকে মিশিয়ে খেয়ে নাও।" এ রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

---

[12] এই হাদীসটি এইভাবে জামে' তিরমিযীতে বর্ণিত রয়েছে। এই রিওয়াইয়াতই অন্যান্য কিতাবে দীর্ঘভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে বহু অস্বীকার্য (মুনকার) কথাও রয়েছে, যেমন বায়তুল লাহামে তার নামায আদায় করা, হযরত সিদ্দীকে আকবরের (রাঃ) তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের নিদর্শন গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা, ইত্যাদি।

দাজ্জালকে তার প্রকৃত রূপে দেখেছিলেন, সেটা ছিল চোখের দেখা, স্বপ্নের দেখা নয়। সেখানে তিনি হযরত ঈসা (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত ইবরাহীমকেও (আঃ) দেখেছিলেন। দাজ্জালের সাদৃশ্য তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সে বিশ্রী, ম্লেচ্ছ এবং ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন। তার একটি চক্ষু এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, যেন তারকা এবং চুল এমন যেন কোন গাছের ঘন শাখা। হযরত ঈসার (আঃ) গঠন তিনি এইভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর রঙ সাদা, চুলগুলি কোঁকড়ানো এবং দেহ মধ্যমাকৃতির। আর হযরত মুসার (আঃ) দেহ গোধূম বর্ণের এবং তিনি দৃঢ় ও সুঠাম দেহের অধিকারী। হযরত ইবরাহীম (আঃ) হুবহু আমারই মত। (শেষ পর্যন্ত)।"

একটি রিওয়াওয়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জাহান্নামের দারোগা মা'লিককেও দেখেছিলেন এ নিদর্শনাবলীর মধ্যে যেগুলি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দেখিয়েছিলেন। অতঃপর তার চাচাতো ভাই হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) পাঠ করেন-وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ فَلَا تَكُن فِى مِرْيَةٍۢ مِّن لِّقَآئِهِۦ ۖ وَجَعَلْنَـٰهُ هُدًى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ (৩২:২৩) এই আয়াতটি। হযরত কাতাদা (রাঃ) এর নিম্নরূপ তাফসীর করেছেনঃ "মূসার (আঃ) সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে তুমি সন্দেহ পোষণ করো না, আমি তাকে অর্থাৎ মুসাকে (আঃ) বাণী ইসরাঈলের হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছিলাম।"[13]

অন্য সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মি'রাজের রাত্রে এক স্থান হতে আমার কাছে এক অতি উচ্চমানের খুশবু'র সুগন্ধ আসছিল। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ এই খুশবূ কিরূপ? হযরত জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে বললেনঃ "ফিরাউনের কন্যার পরিচারিকা এবং তার সন্তানদের প্রাসাদ হতে এই সুগন্ধ আসছে। একদা এই পরিচারিকা ফিরাউনের কন্যার চুল আচঁড়াচ্ছিল। ঘটনাক্রমে তার হাত হতে চিরুণী পড়ে যায়। অকস্মাৎ তার মুখ দিয়ে বিসমিল্লাহ বেরিয়ে যায়। তখন শাহজাদী তাকে বলেঃ "আল্লাহ তো আমার আব্বা"। পরিচারিকাটি তার একথায় বললোঃ "না, বরং আল্লাহ তিনিই যিনি আমাকে, তোমাকে এবং স্বয়ং ফিরাউনকে জীবিকা দান করে থাকেন।" শাহজাদী বললোঃ "তাহলে তুমি কি আমার পিতাকে ছাড়া অন্য কাউকেও তোমার প্রতিপালক স্বীকার করে থাকো?" জবাবে সে বললোঃ "হা, আমার, তোমার এবং তোমার পিতার, সবারই প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলাই।" শাহজাদী এ সংবাদ তার পিতা ফিরআউনের কাছে পৌঁছিয়ে দিলো। এতে ফিরাউন ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ তার দরবারে তাকে ডেকে পাঠালো। সে তার কাছে হাজির হলো। তাকে সে জিজ্ঞেস করলোঃ "তুমি কি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও তোমার প্রতিপালক স্বীকার করে থাকো?" উত্তরে সে বললোঃ "হা, আমার

[13] এই রিওয়াইয়াতটি সহীহ মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে।

এবং আপনার প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলাই বটে।" তৎক্ষণাৎ ফিরাউন নির্দেশ দিলোঃ "তামার যে পাত্রটি নির্মিত আছে ওকে খুবই গরম কর। যখন ওটা সম্পূর্ণরূপে আগুনের মত হয়ে যাবে তখন তার ছেলে মেয়েগুলিকে এক এক করে ওর উপর নিক্ষেপ কর। পরিশেষে তাকে নিজেকেও তাতে নিক্ষেপ করবে।" তার এই নিদের্শ অনুযায়ী ওটাকে গরম করা হলো এবং যখন আগুনের মত হয়ে গেল তখন তার সন্তানদেরকে একের পর এক তাতে নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। পরিচারিকাটি বাদশাহর কাছে একটি আবেদন জানিয়ে বললোঃ "আমার এবং আমার এই সন্তানদের অস্থিগুলি একই জায়গায় নিক্ষেপ করবেন।" বাদশাহ তাকে বললোঃ "ঠিক আছে, তোমার এই আবেদন মঞ্জুর করা হলো। কারণ, আমার দায়িত্বে তোমার অনেকগুলি হক বা প্রাপ্য বাকী রয়ে গেছে।" যখন তার সমস্ত সন্তানকে তাতে নিক্ষেপ করা হয়ে গেল এবং সবাই ভষ্মে পরিণত হলো তখন তার সর্বকনিষ্ঠ শিশুটির পালা আসলো। এই শিশুটি তার মায়ের স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধপান করছিল। ফিরাউনের সিপাহীরা শিশুটিকে যখন তার মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিলো তখন এ সতী সাধ্বী মহিলাটির চোখের সামনে শিশুটির মুখ ফুটে গেল এবং উচ্চ স্বরে বললোঃ আম্মাজান! দুঃখ করবেন না। মোটেই আফসোস করবেন না। সত্যের উপর জীবন উৎসর্গ করাই তো হচ্ছে সবচেয়ে বড় পুণ্যের কাজ।" শিশুর এ কথা শুনে মায়ের মনে সবর এসে গেল। অতঃপর এ শিশুটিকে তাতে নিক্ষেপ করে দিলো এবং সর্বশেষে মাতাকেও তাতে ফেলে দিলো। এই সুগন্ধ তাদের বেহেশতী প্রাসাদ হতেই আসছে (আল্লাহ তাদের সবারই প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই ঘটনাটি বর্ণনা করার পরেই একথাও বর্ণনা করেন যে, চারটি শিশু দোলনাতেই কথা বলছিল। একটি হচ্ছে এই শিশুটি। দ্বিতীয় হচ্ছে এ শিশুটি যে হযরত ইউসুফের (আঃ) পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেছিল। তৃতীয় হলো এ শিশুটি যে আল্লাহর ওয়ালী হযরত জুবায়েজের (রাঃ) পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়েছিল। আর চতুর্থ হলেন হযরত ঈসা ইবনু মরিয়ম (আঃ)।[14]

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ "মি'রাজের রাত্রের সকালে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, জনগণের সামনে এ ঘটনা বর্ণনা করলেই তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।" সুতরাং তিনি দুঃখিত মনে এক প্রান্তে বসে পড়লেন। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলার শত্রু আবূ জেহেল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখে সে তার পার্শ্বেই বসে পড়লো এবং উপহাস করে বললোঃ "কোন নতুন খবর আছে কি?" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তরে বললেনঃ "হা, আছে" সে তা জানতে চাইলো । তিনি বলেনঃ "আজ রাত্রে আমাকে ভ্রমণ করানো হয়েছে" সে প্রশ্ন করলোঃ " কত দূর পর্যন্ত" তিনি জবাবে বললেনঃ "বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত।" সে জিজ্ঞেস করলোঃ " আবার

[14] এই রিওয়াইয়াতটির সনদ ত্রুটি যুক্ত।

এখন এখানে বিদ্যমানও রয়েছো?” তিনি উত্তর দিলেনঃ হা।” এখন এ কষ্টদায়ক ব্যক্তি মনে মনে বললোঃ “এখনই একে মিথ্যাবাদী বলে দেয়া ঠিক হবে না। অন্যথায় হয়তো জনসমাবেশে সে এ কথা বলবেই না।” তাই, সে তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ “এই লোকটি! আমি যদি জনগণকে একত্রিত করি তবে তুমি সবারই সামনেও কি একথাই বলবে?” জবাবে তিনি বললেনঃ “কেন বলবো না? সত্য কথা গোপন করার তো কোন প্রয়োজন নেই” তৎক্ষণাৎ সে উচ্চ স্বরে ডাক দিয়ে বললোঃ “হে বানু কাব -লুঈর সন্তানরা! তোমরা এসে পড়।” সবাই তখন দৌঁড়ে এসে তার পাশে বসে পড়ে। এ অভিশপ্ত ব্যক্তি (আবু জেহেল) তখন তাকে বললোঃ “এখন তুমি তোমার কওমের সামনে এ কথা বর্ণনা কর যে কথা আমার সামনে বর্ণনা করছিলে।” তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের সামনে বলতে শুরু করেনঃ “আজ রাত্রে আমাকে ভ্রমণ করানো হয়েছে।” সবাই জিজ্ঞেস করলোঃ “ কতদূর পর্যন্ত ভ্রমণ করে এসেছো?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত।” জনগণ প্রশ্ন করলোঃ “এখন আবার আমাদের মধ্যেই বিদ্যমানও রয়েছো?” তিনি জবাব দিলেনঃ “হা”। তারা এ কথা শুনে কেউ তো হাত তালি দিতে শুরু করলো, কেউ বা অতি বিস্ময়ের সাথে নিজের হাতের উপর হাত রেখে বসে পড়লো এবং তার অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করতঃ সবাই একমত হয়ে তাকে মিথ্যাবাদী বলে ধারণা করলো। আবার কিছুক্ষণ পর তারা তাকে বললোঃ “আচ্ছা, আমরা তোমাকে তথাকার কতকগুলি অবস্থা ও নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছি, তুমি উত্তর দিতে পারবে কি? তাদের মধ্যে এমন কতকগুলি লোকও ছিল যারা বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছিল এবং তথাকার অলিগলি সম্পর্কে ছিল পূর্ণ ওয়াকিফহাল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তরে বললেনঃ “কি জিজ্ঞেস করবে কর।” তারা জিজ্ঞেস করতে থাকলো এবং তিনি উত্তর দিতে থাকলেন। তিনি বলেনঃ তারা আমাকে এমন কতকগুলি সূক্ষ্ম প্রশ্ন করেছিল যেগুলি আমাকে কিছুটা হতভম্ব করে ফেলেছিল। তৎক্ষণাৎ মসজিদটিকে আমার সামনে করে দেয়া হয়। তখন আমি দেখতে ছিলাম ও বলতে ছিলাম। তোমরা এটাই মনে কর যে, মসজিদটি ছিল আকীলের বাড়ীর পার্শ্বে বা আক্কালের বাড়ীর পার্শ্বে। এটা একারণেই যে, মসজিদের কতকগুলি সিফত বা বিশেষণ আমার স্মরণ ছিল না।” তার এই নিদর্শনগুলির বর্ণনার পর সবাই সমস্বরে বলে উঠলোঃ “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খুঁটিনাটি ও সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! তিনি একটি কথাও ভুল বলেননি।”[15]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) মে'রাজ করানো হয় তখন তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছেন যা সপ্তম আকাশে রয়েছে। যে জিনিস উপরে উঠে তা এখান পর্যন্ত পৌঁছে, তারপর এখান থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়। আর যে

[15] এই হাদীসটি সুনানে নাসাঈ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থেও বিদ্যমান রয়েছে।

জিনিস অবতরণ করে তা এখান পর্যন্ত অবতারিত হয় এবং তারপর এখান থেকে গ্রহণ করা হয়। এ গাছের উপর সোনার ফড়িং ছেয়েছিল। রাস্‌লুল্লাহকে (সাঃ) পাচ ওয়াক্তের নামায এবং সূরায়ে বাকারার শেষের আয়াতগুলি দেয়া হয় এবং এটাও দেয়া হয় যে, তার উম্মতের মধ্যে যারা শির্ক করবে না তাদের কাবীরা গুনাহ গুলিও মাফ করে দেয়া হবে।[16]

হযরত আবু যারবান (রঃ) বলেনঃ আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের (রাঃ) পুত্র হযরত আবু উবাইদার (রাঃ) পার্শ্বে বসে ছিলাম, তার পাশে হযরত মুহাম্মদ ইবনু সাম্‌দ ইবনু সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাসও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনু সা"দ (রাঃ) হযরত আবু উবাইদাকে (রাঃ) বললেনঃ “আপনি মে'রাজ সম্পর্কে আপনার পিতার নিকট থেকে যা শুনেছেন তা বর্ণনা করুন।” তিনি বললেনঃ “না, বরং আপনি যা আপনার পিতার নিকট থেকে শুনেছেন তা আমাদেরকে শুনিয়ে দিন।” তিনি তখন বর্ণনা করতে শুরু করলেন। তাতে এটাও রয়েছে যে, বুরাক যখন উপরের দিকে উঠতো তখন তার হাত-পা সমান হয়ে যেতো। অনুরূপভাবে যখন নীচের দিকে নামতো তখনও সমানই থাকতো, যাতে আরোহীর কোন কষ্ট না হয়। তাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ “আমরা এক ব্যক্তির পার্শ্ব দিয়ে গমন করলাম যিনি ছিলেন দীর্ঘাকৃতির লোক। চুল ছিল সোজা এবং বর্ণ ছিল গোধুম। তিনি ছিলেন এমনই যেমন ইয্‌দে শিনওয়ার গোত্রের লোক হয়ে থাকে। তিনি উচ্চ স্বরে বলতে ছিলেনঃ “আপনি তাঁকে সম্মান দিয়েছেন এবং তাকে মর্যাদা দান করেছেন।” আমরা তাকে সালাম করলাম। তিনি উত্তর দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ হে জিবরাঈল (আঃ)! ইনি কে? উত্তরে তিনি বললেনঃ “ইনি হলেন আহমদ (সঃ)।” তিনি তখন বললেনঃ “আরবী নবী উম্মীকে (সাঃ) মারহাবা, যিনি তার প্রতিপালকের রিসালাত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের উম্মতের মঙ্গল কামনা করেছেন।” এরপর আমরা ফিরে আসলাম। আমি হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলামঃ ইনি কে? জবাবে তিনি বললেনঃ “ইনি হলেনঃ মুসা ইবনে ইমরান (আঃ)।” আমি আবার তাকে প্রশ্ন করলামঃ এরূপ ভাষায় তিনি কার সাথে কথা বলছিলেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ “আপনার ব্যাপারে তিনি আল্লাহ তা’আলার সাথে কথা বলেছিলেন।” আমি বললামঃ আল্লাহর সাথে এবং এই ভাষায়? তিনি জবাব দিলেনঃ “হা, তার তেজস্বিতা সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা সম্যক অবগত।” তারপর আমরা একটা গাছের কাছে গেলাম যার ফলগুলি ছিল প্রদীপের মত। এ গাছের নীচে এক সম্ভ্রান্ত লোক বসেছিলেন, যার পার্শ্বে অনেক ছোট ছোট শিশু ছিল। হযরত জিবরাঈল (আঃ)

---

16 এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থেও এই রিওয়াইয়াতটি হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে মি'রাজের সুদীর্ঘ হাদীস রূপে বর্ণিত আছে। হাসান ইবনু আরফা (রঃ) তার প্রসিদ্ধ খণ্ডে এটা আনয়ন করেছেন। এতে দুর্বলতা রয়েছে।

আমাকে বললেনঃ “চলুন, আপনার পিতা হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) “সালামুন আলাইকা" (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলুন।” আমরা সেখানে গিয়ে তাকে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন। তারপর হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) তিনি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তিনি জবাবে বললেনঃ “ইনি হলেন আপনার ছেলে আহমাদ (সাঃ)।” তখন তিনি বললেনঃ “নবী উম্মীকে (সাঃ) মারহাবা, যিনি তার প্রতিপালকের পয়গাম পূর্ণভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের উম্মতের কল্যাণ কামনা করেছেন। আমার ভাগ্যবান ছেলের আজ রাত্রে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ হবে। তার উম্মত সর্বশেষ উম্মত এবং সবচেয়ে দুর্বলও বটে। খেয়াল রাখতে হবে যেন তাদের উপর এমন কাজের দায়িত্বভার অর্পিত হয় যা তাদের পক্ষে সহজ হয়।” তারপর আমরা মসজিদে আকসায় পৌঁছলাম। আমি নেমে বুরাককে এ হলকায় বাধলাম যেখানে নবীরা বাধতেন। তারপর আমরা মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করলাম। সেখানে আমি নবীদের পরিচয় পেলাম ও তাদের সাথে পরিচিত হলাম। তাদের কেউ নামাযে দণ্ডায়মান ছিলেন, কেউ ছিলেন রুকুতে এবং কেউ ছিলেন সিজদাতে। এরপর আমার কাছে মধু ও দুধের পাত্র আনয়ন করা হলো। আমি দুধের পাত্রটি নিয়ে তা পান করলাম। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমার স্কন্ধে হাত রেখে বললেনঃ মুহাম্মদ (সঃ)-এর রবের শপথ! আপনি ফিতরাতে (প্রকৃতিতে) পৌছে গেছেন।” তারপর নামাযের তাকবীর হলো এবং সকলকে আমি নামায পড়ালাম। এরপর আমরা ফিরে আসলাম।”[17]

হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মি'রাজের রাত্রে হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত ঈসার (আঃ) সঙ্গে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাক্ষাৎ হয়। সেখানে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে আলোচনা হয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ “কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় আমার জানা নেই। এটা হযরত মুসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করুন।” তিনিও

[17] এর ইসনাদ দুর্বল। মতনের মধ্যেও অস্বাভাবিকতা রয়েছে। যেমন নবীদের পরিচয় লাভ করার জন্যে তার প্রশ্ন করা, তারপর তার তাদের নিকট থেকে যাওয়ার পর তাঁদের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্যে প্রশ্নকরণ ইত্যাদি। অথচ সহীহ হাদীস সমূহে রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) প্রথমেই তাকে বলে আসছিলেন যে, ইনি হলেন অমুক নবী, যাতে সালামটা হয় পরিচিতির পর। তারপর এতে রয়েছে যে, নবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে প্রবেশ করার পূর্বেই। অথচ বিশুদ্ধ রিওয়াইয়াত সমূহে আছে যে, তদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল বিভিন্ন আসমানে। মসজিদে আগমন করেন। তারাও সবাই তার সাথে ছিলেন এবং সেখানে তিনি তাদেরকে নামায পড়ান। তারপর বুরাকের উপর সওয়ার হয়ে তিনি মক্কা শরীফ পোঁছেন। এ সব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ।

এটা না জানার খবর প্রকাশ করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এ ব্যাপারে হযরত ঈসাকে আঃ জিজ্ঞেস করা হোক। হযরত ঈসা (আঃ) বলেনঃ “এর সঠিক সংবাদ তো একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না, তবে আমাকে এটুকু জানানো হয়েছে যে, দাজ্জাল বের হবে। এ সময় আমার হাতে থাকবে দুটি ছড়ি। সে আমাকে দেখা মাত্রই সীসার মত গলে যাবে। অবশেষে আমার কারণে আল্লাহ তা’আলা তাকে ধ্বংস করে দিবেন। তারপর গাছ এবং পাথরও বলে উঠবেঃ হে মুসলমান! দেখ, আমার নীচে এক কাফির লুকিয়ে আছে, তাকে হত্যা কর।” সুতরাং আল্লাহ তা’আলা তাদের সকলকেই ধ্বংস করে দিবেন। জনগণ প্রশান্ত মনে নিজেদের শহরে ও দেশে ফিরে যাবে। এ যুগেই ইয়াজুজ মা'জুজ বের হবে। তারা প্রত্যেকে উচু স্থান হতে লাফাতে লাফাতে আসবে। তারা যা পাবে তাই
ধ্বংস করে দেবে। পানি দেখলে তা পান করে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত মানুষ অসহ্য হয়ে আমার কাছে অভিযোগ করবে। আমি তখন মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবো। তিনি তাদেরকে একই সাথে ধ্বংস করে দিবেন। কিন্তু তাদের মৃতদেহের দুর্গন্ধের কারণে চলাফেরা মুশকিল হয়ে পড়বে। এ সময় আল্লাহ তা’আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যা তাদের মৃত দেহগুলিকে বইয়ে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেবে। আমার খুব ভাল রূপেই জানা আছে যে, এরপরেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। যেমন পূর্ণ দিনের গর্ভবতী মহিলা জানতে পারে না যে, হয়তো সকালেই সে সন্তান প্রসব করবে, না হয় রাত্রে প্রসব করবে।[18]

আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) মসজিদে হারাম হতে বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়, এ রাত্রে তিনি যমযম কূপ ও মাকামে ইবরাহীমের (আঃ) মাঝামাঝি জায়গায় ছিলেন, এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) ডান দিক থেকে এবং হযরত মীকাঈল (আঃ) বাম দিক থেকে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত তিনি আকাশের উচ্চতম স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যান। ফিরবার সময় তিনি তাদের তসবীহ এবং অন্যান্যদের তসবীহ পাঠ শুনতে পান। এই রিওয়াইয়াত এই সূরারই تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ (১৭:৪৪) এর আয়াতের তফসীরে আসবে।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, আমীরুল মু’মিনীন হযরত উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) একবার জা’বিয়াহ্ নামক জায়গায় ছিলেন। ঐ সময় বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের আলোচনা হয়। হযরত কা'বকে (রাঃ) তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমার ধারণায় আমাকে সেখানে কোন জায়গায় নামায

[18] এটা ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

পড়া উচিত?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “আমাকে যখন জিজ্ঞেস করছেন তখন আমার মতে সাখরার পিছনে আপনার নামায পড়া উচিত যাতে বায়তুল মুকাদ্দাস আপনার সামনে হয়।” একথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) তাকে বললেনঃ “তাহলে তুমি তো ইয়াহুদীদের সাথেই সাদৃশ্য স্থাপন করলে? আমি তো এ জায়গাতেই নামায পড়বো যেখানে নবী (সাঃ) নামায পড়েছিলেন।” সুতরাং তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে কিবলার দিক হয়ে নামায আদায় করেন। নামায শেষে তিনি সাখরার আশ পাশের সমস্ত খড়কুটা কুড়িয়ে একত্রিত করেন এবং ওগুলি নিজের চাদরে বেঁধে বাইরে ফেলে দিতে শুরু করেন। তার দেখা দেখি জনগণও এরূপ করেন। সুতরাং এ দিন তিনি ইয়াহুদীদের মত সাখরার সম্মানও করলেন না যে, তারা ওর পিছনে নামাযও পড়তো, এমনকি তারা ওটাকে কিবলা বানিয়ে রেখেছিল। হযরত কা'ব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইয়াহুদী ছিলেন বলেই তিনি এই মতই পেশ করেছিলেন, যা খলীফাতুল মুসলেমীন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আবার খৃষ্টানদের মত তিনি সাখরার প্রতি তাচ্ছিল্যও প্রকাশ করলেন না। তারা তো সাখরাকে খড়কুটা ফেলার জায়গা বানিয়ে নিয়েছিল। বরং স্বয়ং তিনি সেখান থেকে খড়কুটা কুড়িয়ে নিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করেন। এটা ঠিক এ হাদীসের সাথেই সাদৃশ্য যুক্ত যেখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা কবরের উপর বসো না এবং এ দিকে নামাযও পড়ো না।”

মি'রাজ সম্পর্কিত একটি সুদীর্ঘ 'গারীব' হাদীস হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে। তাঁতে রয়েছে ষে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) ও হযরত মীকাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট আগমন করেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত মীকাঈলকে (আঃ) বলেনঃ “আমার কাছে থালা ভর্তি যমযমের পানি নিয়ে এসো। আমি ওর দ্বারা হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) অন্তর পবিত্র করবো এবং তার বক্ষ খুলে দিবো।” অতঃপর তিনি তার পেট বিদীর্ণ করলেন এবৎ ওটা তিনবার ধৌত করলেন। তিনবারই তিনি হযরত মীকাঈলের (আঃ) আনিত পানির তশ্ত দ্বারা তা ধুলেন। তার বক্ষ খুলে দিলেন এবং ওর থেকে সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ ও কালিমা দূর করে দিলেন। আর ওটা ঈমান ও ইয়াকীন দ্বারা পূর্ণ করলেন। তাতে ইসলাম ভরে দিলেন এবং তার দু' কাধের মাঝে মহরে নুবুওয়াত স্থাপন করলেন। তারপর তাঁকে একটি ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে তাঁকে নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আঃ) চলতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দেখতে পেলেন যে, এক কওম একদিকে ফসল কাটছে, অন্যদিকে ফসল গজিয়ে যাচ্ছে। হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “এ লোকগুলি কারা?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “এরা হচ্ছে আল্লাহর পথের মুজাহিদ যাদের পুণ্য সাতশ'গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তারা যা খরচ করে তার প্রতিদান তারা পেয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা উত্তম রিযক দাতা ।” তারপর তিনি এমন কওমের পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন যাদের মস্তক প্রস্তর দ্বারা পিষ্ট করা হচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ “এ

লোকগুলি কারা?” জবাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ এরা হচ্ছে ঐ সব লোক যাদের মাথা ফরয নামাযের সময় ভারী হয়ে যেতো।” রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ “এমন কতকগুলি লোককে আমি দেখলাম যাদের সামনে ও পিছনে বস্ত্র খণ্ড লটকানো আছে এবং তারা উট ও অন্যান্য জন্তুর মত জাহান্নামের কাঁটাযুক্ত গাছ খাচ্ছে এবং দোযখের পাথর ও অঙ্গার ভক্ষণ করছে। আমি প্রশ্ন করলামঃ এরা কারা? উত্তরে তিনি (জিবরাঈল আঃ) বললেনঃ “এরা ঐ সব লোক যারা তাদের মালের যাকাত প্রদান করতো না। আল্লাহ তাদের উপর যুলুম করেন নাই, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করতো।” এরপর আমি এমন কতকগুলি লোককে দেখলাম যাদের সামনে একটি পাতিলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও উত্তম গোশ্ত রয়েছে এবং অপর একটি পাতিলে রয়েছে পচা-সড়া ও দুর্গন্ধময় গোশত। তাদেরকে এ উত্তম গোশত থেকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তারা এ পচা-সড়া ও দুর্গন্ধময় গোশত ভক্ষণ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ এ লোকগুলি কোন্ পাপ কার্য করেছিল? জবাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ “এরা হলো ঐ সব পুরুষ যারে নিজেদের হালাল স্ত্রীদেরকে ছেড়ে দিয়ে হারাম স্ত্রীদের পার্শ্বে রাত্রি যাপন করতো এবং ঐ সব স্ত্রীলোক যারা তাদের হালাল স্বামীদেরকে ছেড়ে অন্য পুরুষ লোকদের ঘরে রাত্রি কাটাতো।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দেখেন যে, পথে একটি কাঠ রয়েছে এবং ওটা প্রত্যেক কাপড়কে ছিঁড়ে দিচ্ছে এবং প্রত্যেক জিনিসকে যখম করছে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ এটা কি? জবাবে হযরত.জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ “এটা হচ্ছে আপনার উম্মতের ঐ লোকদের দৃষ্টান্ত যারা রাস্তা ঘিরে বসে যায়।” অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করলেনঃ

وَلَا تَقْعُدُوا۟ بِكُلِّ صِرَٰطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ

অর্থাৎ “তোমরা লোকদেরকে ভীত করা ও আল্লাহর পথ হতে বাধা দানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাস্তার উপর বসো না। (৭:৮৬)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ “আমি দেখলাম যে, একটি লোক এক বিরাট স্তূপ জমা করেছে যা সে উঠাতে পারছে না। অথচ আরো বাড়াতে রয়েছে। আমি প্রশ্ন করলামঃ এটা কে? জবাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ “এটা হচ্ছে আপনার উম্মতের ঐ লোক যার উপর মানুষের এতো বেশী হক বা প্রাপ্য রয়েছে যা আদায় করার ক্ষমতা তার নেই, তথাপি নিজের উপর আরো প্রাপ্য বাড়িয়ে চলেছে এবং জনগণের আমানত গ্রহণ করতেই আছে।” তারপর আমি এমন একটি দল দেখলাম যাদের জিহবা ও ঠোট লোহার কেচি দ্বারা কর্তন করা হচ্ছে। একদিক কর্তিত হচ্ছে এবং অপর দিকে ঠিক হয়ে যাচ্ছে, আবার এ দিক কর্তিত হচ্ছে। এই অবস্থায়ই অব্যাহত রয়েছে। জিজ্ঞেস করলামঃ এরা কারা? হযরত জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে বললেনঃ এরা হচ্ছে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টিকারী বক্তা ও উপদেষ্টা।” তারপর দেখি যে, একটি ছোট পাথরের ছিদ্র

দিয়ে একটি বিরাট বলদ বের হচ্ছে এবং আবার তাতে ফিরে যেতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে জিবরাঈল (আঃ)! এটা কে? জবাবে তিনি বললেনঃ "যে মুখে খুব বড় বড় বুলি আওড়াতো, তারপর লজ্জিত হতো বটে, কিন্তু ওর থেকে ফিরতে পারতো না।" তারপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি উপত্যকায় পৌঁছেন। সেখানে অত্যন্ত সুন্দর মন মাতানো ঠাণ্ডা বাতাস এবং মনোমুগ্ধকর সুগন্ধ ও আরাম ও শান্তির বরকতময় শব্দ শুনে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "এটা কি?" উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ "এটা হচ্ছে জান্নাতের শব্দ। সে বলছেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমার সাথে আপনি যে ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ করুন! আমার অট্টালিকা, রেশম, মনিমুক্তা, সোনারুপা, জাম-বাটী, মধু, দুধ, মদ ইত্যাদি নিয়ামতরাজি খুব বেশী হয়ে গেছে।" তাকে তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে জবাব দেয়া হয়ঃ "প্রত্যেক মুসলমান-মুমিন নর ও নারী যে আমাকে ও আমার রাসূলদেরকে মেনে চলে, ভাল কাজ করে, আমার সাথে কাউকেও শরীক করে না, আমার সমকক্ষ কাউকেও মনে করে না, তারা সবাই তোমার মধ্যে প্রবেশ করবে। জেনে রেখো, যার অন্তরে আমার ভয় আছে সে সমস্ত ভয় থেকে রক্ষিত থাকবে। যে আমার কাছে চায় সে বঞ্চিত হয় না। যে আমাকে কর্জ দেয় অর্থাৎ কর্জে হাসানা দেয় তাকে আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি। যে আমার উপর ভরসা করে আমি তার জন্যে যথেষ্ট হই। আমি সত্য মা'বুদ। আমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। আমি ওয়াদার খেলাফ করি না। মুমিন মুক্তিপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাআলা কল্যাণময়। তিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা" একথা শুনে জান্নাত বললোঃ "যথেষ্ট হয়েছে। আমি খুশী হয়ে গেলাম।" এরপর আমি অন্য একটি উপত্যকায় গেলাম। যেখান থেকে বড় ভয়ানক ও জঘন্য শব্দ আসছিল। আর ছিল খুবই দুর্গন্ধ। আমি এসম্পর্কে হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "এটা হচ্ছে জাহান্নামের শব্দ। সে বলছেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার সাথে যে, ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ করুন! আমাকে তা দিয়ে দিন! আমার শৃংখল, আমার অগ্নিশিখা, আমার প্রখরতা, আমার রক্ত-পুঁজ এবং আমার শাস্তির আসবাবপত্র খুবই বেশী হয়ে গেছে, আমার গভীরতাও অত্যন্ত বেড়ে গেছে এবং আমার অগ্নি ভীষণ তেজ হয়ে উঠেছে। সুতরাং আমার মধ্যে যা দেয়ার আপনি ওয়াদা করেছেন তা দিয়ে দিন" আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে বলেনঃ "প্রত্যেক মুশরিক কাফির, খবীস, বেঈমান পুরুষ ও নারী তোমার জন্যে রয়েছে।" একথা শুনে জাহান্নাম সন্তোষ প্রকাশ করলো।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবার চলতে থাকলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে গেলেন। নেমে তিনি সাখরার স্তম্ভে ঘোড়া বাধলেন এবং ভিতরে গিয়ে ফেরেশতাদের সাথে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে তারা জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে জিবরাঈল (আঃ)! আপনার সাথে ইনি

কে?” তিনি জবাব দিলেনঃ “ ইনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)।” তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করলেন তার কাছে কি পাঠানো হয়েছিল?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “হা”। সবাই তখন মারহাবা বললেন এবং আরো বললেনঃ “উত্তম ভাই, অতি উত্তম প্রতিনিধি। তিনি খুবই বড় মর্যাদার সাথে এসেছেন।” তারপর তার সাক্ষাৎ হলো নবীদের রূহগুলোর সাথে। সবাই নিজেদের প্রতিপালকের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেনঃ “আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তিনি আমাকে নিজের বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছেন এবং আমাকে বড় রাজ্য দান করেছেন। আর আমার উম্মত এমনই অনুগত যে, তাদের অনুসরণ করা হয়ে থাকে। তিনিই আমাকে আগুন থেকে রক্ষা করেছেন এবং ওটাকে আমার জন্যে ঠাণ্ডা ও প্রশান্তি বানিয়েছেন” হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ “এটা আল্লাহ তা'আলারই বড় মেহেরবানী যে, তিনি আমার সাথে কথা বলেছেন, আমার শত্রু ফিরআউনীদেরকে ধবংস করেছেন, বাণী ইসরাঈলকে আমার মাধ্যমে মুক্তি দিয়েছেন এবং আমার উম্মতের মধ্যে এমন দল রেখেছেন যারা সত্যের পথ প্রদর্শক এবং ন্যায়ের সাথে বিচার মীমাংসাকারী।” তারপর হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণকীর্তণ করতে শুরু করলেন। তিনি বললেনঃ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যে, তিনি আমাকে বিরাট সাম্রাজ্য দান করেছেন। আমাকে দান করেছেন তিনি অলংকার তৈরির জ্ঞান। আমার জন্য তিনি লোহাকে নরম করে দিয়েছেন। পাহাড় পবর্তকে করেছেন অনুগত। এমনকি পাখীরাও আমার সাথে আল্লাহর তসবীহ পাঠ করতো। তিনি আমাকে দান করেছেন হিকমত ও জোরালোভাবে বক্তৃতা দেয়ার ক্ষমতা।” এরপর হযরত সুলাইমান (আঃ) আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতে শুরু করেন। তিনি বলেনঃ “যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই জন্যে যে, তিনি বায়ুকে আমার বাধ্য করে দিয়েছেন এবং শয়তানদেরকেও করেছেন আমার অনুগত। তারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী বড় বড় প্রাসাদ, নক্শা, পাত্র ইত্যাদি তৈরী করতো। তিনি আমাকে জীব জন্তুর ভাষা বুঝার জ্ঞান দান করেছেন। সব কিছুর উপর তিনি আমাকে মর্যাদা দিয়েছেন। দানব, মানব এবং পাখীর লশ্করকে আমার অধীনস্থ করে দিয়েছেন এবং তাঁর বহু মুমিন বান্দাদের উপর আমাকে ফযীলত দান করেছেন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য ও রাজত্ব দান করেছেন যা আমার পরে আর কারো জন্যে শোভনীয় নয়। আর তা আবার এমন যে, তাতে অপবিত্রতার লেশমাত্র নেই এবং কোন হিসাবও নেই।“ অতঃপর হযরত ঈসা আঃ) আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতে শুরু করেন। তিনি বলেনঃ “তিনি আমাকে নিজের “কালেমা” বানিয়েছেন এবং আমার দৃষ্টান্ত হচ্ছে হযরত আদমের (আঃ) মত। তাকে তিনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করে বলেছিলেনঃ “হও, আর তেমনই তিনি হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত, ও ইনজীল শিক্ষা দিয়েছেন। আমি মাটি দ্বারা পাখি ও শ্বেত কুষ্টরোগীকে আল্লাহর হুকুমে ভাল করে দিতাম। আল্লাহর নির্দেশক্রমে আমি মৃতকে জীবিত করতাম। আমাকে তিনি উঠিয়ে নিয়েছেন এবং আমাকে পবিত্র করেছেন! আমাকে ও আমার

মাতাকে শয়তান থেকে রক্ষা করেছেন! শয়তান আমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারতো না।" এখন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেনঃ "আপনারা তো আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন, আমি এখন তার প্রশংসা করছি। আল্লাহ তা'আলার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে বিশ্বশান্তির দূত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাকে সমস্ত সৃষ্ট জীবের জন্যে ভয় প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা বানিয়েছেন। তিনি আমার উপর কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছেন। যাতে সমস্ত কিছুর বর্ণনা রয়েছে। তিনি আমার উম্মতকে সমস্ত উম্মতের উপর ফযীলত দান করেছেন। তাদেরকে সকলের মঙ্গলের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে করেছেন সর্বোত্তম উম্মত। তাদেরকেই তিনি প্রথমের ও শেষের উম্মত বানিয়েছেন। তিনি আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে আমার মধ্যকার সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ ও গ্লানি দূর করেছেন। আমার খ্যাতি তিনি সমুন্নত করেছেন এবং আমাকে তিনি শুরুকারী ও শেষকারী বানিয়েছেন।" হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেনঃ "হে মুহাম্মদ (সঃ)! এসব কারণেই আপনি সবারই উপর ফযীলত লাভ করেছেন।"

ইমাম আবু জা'ফর রা'যী (রঃ) বলেনঃ "হযরত মুহাম্মদই (সাঃ) শুরুকারী অর্থাৎ কিয়ামতের দিন শাফাআ"ত বা সুপারিশ তার থেকেই শুরু হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহর (সঃ) সামনে উপরাচ্ছাদিত তিনটি পাত্র পেশ করা হয়। পানির পাত্র হতে সামান্য পাঁনি পান করে তা ফিরিয়ে দেন। তারপর দুধের পাত্র নিয়ে তিনি পেট পুরে দুধ পান করেন। এরপর তার কাছে মদের পাত্র আনয়ন করা হয়, কিন্তু তিনি তা পান করতে অস্বীকার করেন এবং বলেনঃ "আমার পেট পূর্ণ হয়ে গেছে এবং আমি পরিতৃপ্ত হয়েছি" হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে বললেনঃ "এই মদ আপনার উম্মতের জন্যে হারাম করে দেয়া হবে। যদি আপনি এর থেকে পান করতেন তবে আপনার উম্মতের মধ্যে আপনার অনুসারী খুবই কম হতো ।"

এরপর রাসূলুল্লাহকে (সঃ) আকাশের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দরজা খুলতে বলা হলে প্রশ্ন হয়ঃ "কে?" হযরত জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেনঃ "হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)।" আবার প্রশ্ন করা হয়ঃ "তার কাছে কি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে?" উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ "হা" তারা তখন বলেনঃ "আল্লাহ তাআলা এই উত্তম ভাই ও উত্তম প্রতিনিধিকে সন্তুষ্ট রাখুন। ইনি বড়ই উত্তম ভাই এবং খুবই ভাল প্রতিনিধি।" তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দেখেন যে, পূর্ণ সৃষ্টির একটি লোক রয়েছেন, যার সৃষ্টিতে কোনই ক্রটি নেই যেমন সাধারণ লোকের সৃষ্টির মধ্যে ক্রটি থাকে। তার ডান দিকে রয়েছে একটি দরজা যেখান দিয়ে বাতাস সুগন্ধি বয়ে আনছে। বাম দিকেও রয়েছে একটি দরজা, যেখান দিয়ে দুর্গন্ধময় বাতাস বয়ে আসছে। ডান দিকের দরজার দিকে তাকিয়ে তিনি হাসছেন এবং আনন্দিত হচ্ছেন। আর বাম

দিকের দরজার দিকে তাকিয়ে তিনি কেঁদে ফেলছেন এবং দুঃখিত হচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে জিবরাঈল (আঃ)! পূর্ণ সৃষ্টির এই বৃদ্ধ লোকটি কে? উত্তরে তিনি বললেনঃ "ইনি হলেন আপনার পিতা হযরত আদম (আঃ)। তার ডান দিকে রয়েছে জান্নাতের দরজা। তার জান্নাতী সন্তানদেরকে দেখে তিনি খুশী হয়ে হাসছেন। আর তার বাম দিকে রয়েছে জাহান্নামের দরজা । তিনি তার জাহান্নামী সন্তানদের দেখে দুঃখিত হয়ে কেঁদে ফেলছেন।"

তারপর তাঁকে দ্বিতীয় আকাশের উপর উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অনুরূপ প্রশ্নোত্তরের পর আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়ঃ সেখানে তিনি দু'জন যুবককে দেখতে পান। হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করে তিনি জানতে পারেন যে, তাদের একজন হলেন হযরত ঈসা ইবনু মরিয়ম (আঃ) ও অপরজন হলেন হযরত ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া (আঃ) তারা দু'জন একে অপরের খালাতো ভাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তৃতীয় আকাশে পৌঁছেন। সেখানে তিনি হযরত ইউসুফকে (আঃ) দেখতে পান, যিনি সৌন্দর্যে অন্যান্য লোকদের উপর এমনই ফযিলত লাভ করেছিলেন যেমন ফযিলত রয়েছে চন্দ্রের সমস্ত তারকার উপর। অনুরূপভাবে তিনি চতুর্থ আকাশে পৌঁছেন। তথায় তিনি হযরত ইদরীসকে (আঃ) দেখতে পান, যাকে আল্লাহ তা'আলা মর্যাদাপূর্ণ স্থানে উঠিয়ে নিয়েছেন। অনুরূপ প্রশ্ন ও উত্তরের আদান প্রদানের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পঞ্চম আকাশে পৌঁছেন। দেখেন যে, একজন বসে আছেন এবং তার আশে পাশে কতকগুলি লোক রয়েছেন যারা তার সাথে আলাপ করছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "ইনি কে?" উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ "ইনি হলেন হযরত হারূণ (আঃ)। ইনি নিজের কওমের মধ্যে ছিলেন একজন হৃদয়বান ব্যক্তি। আর এই লোকগুলি হচ্ছে বনী ইসরাঈল।" তারপর তিনি ষষ্ঠ আকাশে পৌঁছেন। সেখানে তিনি হযরত মুসাকে (আঃ) দেখতে পান। তিনি তার চেয়েও উপরে উঠে যান দেখে তিনি কেঁদে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার কাঁদার কারণ হযরত জিবরাঈলের (আঃ) কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেনঃ "এঁর সম্পর্কে বানী ইসরাঈলের এই ধারণা ছিল যে, সমস্ত বনী আদমের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট তারই মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। কিন্তু এখন তিনি দেখতে পেলেন যে, আল্লাহ তাআলার নিকট হযরত মুহাম্মদের (সঃ) মর্যাদাই সর্বাপেক্ষা বেশী। তাই, তিনি কেঁদে ফেললেন।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) সপ্তম আকাশে পৌঁছেন। সেখানে তিনি এমন একটি লোককে দেখতে পান যার দাড়ীর কিছু অংশ সাদা হয়ে গিয়েছিল। তিনি জান্নাতের দরজার উপর একটি চেয়ার লাগিয়ে বসে ছিলেন। তার পার্শ্বে আরো কিছু লোকও ছিলেন। কতকগুলি চেহারা ঔজ্জ্বল ঝকঝকে, কিন্তু কতকগুলি চেহারায় ঔজ্জ্বল্য কিছু কম ছিল এবং রঙ এ কিছুটা ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এই লোকগুলি উঠে গিয়ে নদীতে ডুব দিলো। ফলে রঙ কিছুটা পরিষ্কার হলো। তারপর আর এক নহরে তারা ডুব দিলো। এবার রঙ আরো কিছুটা পরিচ্ছন্ন হলো।

এরপর তারা তৃতীয় একটি নহরে গোসল করলো। এবার তাদের উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোকদের সাথে মিলিত ভাবে বসে পড়লো। এখন তারা তাদের মতই হয়ে গেল। হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এঁদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "বৃদ্ধ লোকটি হলেন আপনার পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)। সারা দুনিয়ায় সাদা চুল সর্বপ্রথম তারই দেখা যায়। ঐ উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোক হচ্ছে ঐ সব ঈমানদার লোক যারা মন্দ কাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থেকেছে। আর যাদের চেহারায় কিছুটা কালিমা ছিল তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা ভাল কাজের সাথে কিছু খারাপ কাজও করেছিল তারা তাওবা করায় মহান আল্লাহ তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। প্রথমে তারা গোসল করেছে নহরে রহমতে, দ্বিতীয় বার নহের নিয়ামতিল্লাহ হতে এবং তৃতীয়বার নহরে শরাবে তহুরে। এই শরাব হচ্ছে জান্নাতীদের বিশিষ্ট শরাব বা মদ।"

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছেন। তখন তাকে বলা হলোঃ "আপনার সুন্নাতের যারা অনুসরণ করবে তাদেরকে এখান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। এর মূল থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পানি, খাঁটি দুধ, নেশাহীন সুস্বাদু মদ এবং পরিষ্কার মধুর নহর প্রবাহিত রয়েছে। এ গাছের ছায়ায় কোন সওয়ার যদি সত্তর বছরও ভ্রমণ করে তথাপি ওর ছায়া শেষ হবে না। ওর এক একটি পাতা এতো বড় যে, একটি উম্মতকে ঢেকে ফেলবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহর নূর ওকে চতুর্দিক থেকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। আর পাখীর আকৃতি বিশিষ্ট ফেরেশতারা ওটাকে ঢেকে ফেলে ছিলেন, যাঁরা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার মুহব্বতে সেখানে ছিলেন। এ সময় মহামহিম আল্লাহ রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে কথা বলেন। তিনি তাকে বলেনঃ "কি চাবে চাও?" উত্তরে তিনি বলেনঃ হে আল্লাহ! আপনি হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) আপনার দোস্ত বানিয়েছেন এবং তাঁকে বড় সাম্রাজ্য দান করেছেন, হযরত মূসার (আঃ) সাথে আপনি কথা বলেছেন, হযরত দাউদকে (আঃ) দিয়েছেন বিরাট সাম্রাজ্য এবং তার জন্যে লোহাকে নরম করে দিয়েছেন, হযরত সুলাইমানকে (আঃ) আপনি দান করেছেন রাজত্ব, দানব, মানব, শয়তান ও বাতাসকে তার অনুগত করে দিয়েছেন, আর তাকে এমন রাজত্ব দান করেছেন যা তার পরে আর কারো জন্যে উপযুক্ত নয়, হযরত ঈসাকে (আঃ) তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দিয়েছেন, আপনার নির্দেশক্রমে আপনি তাকে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দানকারী করেছেন ও মৃতকে জীবন দানকারী বানিয়েছেন, তাঁকে ও তার মাতাকে বিতাড়িত শয়তান হতে রক্ষা করেছেন, তাঁদের উপর শয়তানের কোন হাত নেই। এখন আমার সম্পর্কে কি বলবেন বলুন।" তখন বিশ্বপ্রতিপালক মহামহিমান্বিত আল্লাহ বললেনঃ "তুমি আমার খলীল (দোস্ত)। তাওরাতে আমি তোমাকে "খলীলুর রহমান' উপাধিতে ভূষিত করেছি। তোমাকে আমি সমস্ত মানুষের নিকট ভয় প্রদর্শক ও সুসংবাদ দাতারূপে প্রেরণ করেছি। তোমার বক্ষ আমি

বিদীর্ণ করেছি, তোমার বোঝা হালকা করেছি এবং তোমার যিকর সমুন্নত করেছি। যেখানে আমার যিকর হয় সেখানে তোমারও যিকর হয়ে থাকে।[19] তোমার উম্মতকে আমি সর্বোত্তম উম্মত বানিয়েছি, যাদেরকে জনগণের কল্যাণের নিমিত্তে বের করা হয়েছে। তোমার উম্মতকেও আমি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বানিয়েছি। তাদের খুৎবা জায়েয নয় যে পর্যন্ত না তারা তোমাকে আমার বান্দা ও রাসূল বলে সাক্ষ্য দেবে। আমি তোমার উম্মতের মধ্যে এমন কতকগুলি লোক রেখেছি যাদের অন্তরে তাদের কিতাবসমূহ রয়েছে। সৃষ্টি হিসেবে আমি তোমাকে সর্বপ্রথম করেছি এবং বি'ছাত হিসেবে সর্বশেষ করেছি। আমি তোমাকে এমন সাতটি আয়াত দিয়েছি যা বারবার পাঠ করা হয়ে থাকে।[20] এ আয়াতগুলি তোমার পূর্বে আর কাউকেও দেয়া হয় নাই। তোমাকে আমি কাওসার দান করেছি এবং ইসলামের আটটি অংশ দিয়েছি। ওগুলি হচ্ছেঃ ইসলাম, হিজরত, জিহাদ, নামায, সাদকা, রমযানের রোযা, ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ। আমি তোমাকে শুরুকারী ও শেষকারী বানিয়েছি।" সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতে লাগলেনঃ "আমাকে আমার প্রতিপালক ছ"টি জিনিসের ফযীলত দিয়েছেন। সেগুলি হচ্ছেঃ কালামের শুরু ও শেষ আমাকে দেয়া হয়েছে, আমাকে দান করা হয়েছে জামে' কালাম (ব্যাপক ভাবপূর্ণ কথা), সমস্ত মানুষের নিকট আমাকে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করা হয়েছে, এক মাসের পথের ব্যবধান থেকে শত্রুদের উপর আমার ভীতি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ এক মাসের পথের দূরত্বে থেকেও শত্রুরা আমার নামে সদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। আমার জন্যে গনীমতের মাল (যুদ্ধ লব্ধ মাল) হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কারো জন্যে হালাল ছিল না এবং আমার জন্যে সারা যমীনকে মসজিদ (সিজদার স্থান) ও অযুর স্থান বানানো হয়েছে।" তারপর রাসূলুল্লাহর (সাঃ) উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়া এবং হযরত মুসার (আঃ) পরামর্শক্রমে আল্লাহ তাআ"লার কাছে নামাযের ওয়াক্ত কমাবার প্রার্থনা করা ও সর্বশেষে পাঁচ ওয়াক্ত থেকে যাওয়ার বর্ণনা রয়েছে। যেমন ইতিপূর্বে গত হয়েছে। সুতরাং পড়তে পাঁচ কিন্তু সওয়াবে পঞ্চাশ। এতে তিনি খুবই খুশী হন। যাওয়ার সময় হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন কঠিন এবং আসার সময় হয়ে গেলেন অত্যন্ত কোমল ও সর্বোত্তম।

অন্য কিতাবের এই হাদীসে এটাও রয়েছে যে, سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ

---

[19] যেমন পাঁচ বারের আযানে বলা হয়ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই।' এর পরেই বলা হয়ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল।' যিকর দ্বারা এখানে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

[20] এই সাতটি আয়াত দ্বারা সূরায়ে ফাতেহাকে বুঝানো হয়েছে।

এই আয়াতেরই তাফসীরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করেন।[21] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের একটি রিওয়াইয়াতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত ইবরাহীমের (আঃ) দেহাকৃতির বর্ণনা দেয়ার কথাও বর্ণিত রয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে হাতীমে রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং তার সামনে ওটা প্রকাশিত হওয়ার ঘটনাও রয়েছে। তাতেও এই তিনজন নবীর সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তাদের দৈহিক গঠনের বর্ণনা রয়েছে এবং এও আছে যে, তিনি তাদেরকে নামাযে দণ্ডায়মান পেয়েছিলেন। তিনি জাহান্নামের রক্ষক মা'লিককেও দেখেছিলেন এবং তিনিই প্রথমে তাকে সালাম করেন। ইমাম বায়হাকীর (রঃ) হাদীস গ্রন্থে কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত উম্মে হানীর (রাঃ) বাড়ীতে শুয়ে ছিলেন। তখন তিনি এশার নামায হতে ফারেগ (অবকাশপ্রাপ্ত) হয়েছিলেন। সেখান হতেই তার মি'রাজ হয়। অতঃপর ইমাম হাকিম (রঃ) খুবই দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে শ্রেণী বিভাগ, ফেরেশতামন্ডলী ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। কোন কিছুই আল্লাহ তা'আলার শক্তির বাইরে নয়, যদি এ রিওয়াইয়াত সঠিক প্রমাণিত হয়ে যায়। ইমাম বায়হাকী (রঃ) এই রিওয়াইয়াত বর্ণনা করার পর বলেন যে, মক্কা শরীফ হতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গমন এবং মি'রাজের ব্যাপারে এই হাদীসে পূর্ণ প্রাচুর্য রয়েছে। কিন্তু এই রিওয়াইয়াতকে অনেক ইমাম মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম বায়হাকী (রঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন যে, সকালে যখন রাসূলুল্লাহ মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করেন তখন বহু লোক মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায় যারা ইতিপূর্বে ঈমান আনয়ন করেছিল। তারপর হযরত সিদ্দীকে আকবারের (রাঃ) নিকট তাদের গমন, তার সত্যায়িতকরণ এবং সিদ্দীক উপাধি ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।

---

21 প্রকাশ থাকে যে, এই সুদীর্ঘ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হলেন আবূ জা'ফর রাযী। তার স্মরণ শক্তি খুব ভাল নয়। এর কতকগুলি শব্দে খুবই গারাবত ও নাকারত রয়েছে। একে দুর্বলও বলা হয়েছে। আর শুধু তারই বর্ণিত হাদীস সমালোচনা মুক্ত নয়। কথা এই যে, স্বপ্নযুক্ত হাদীসের কিছু অংশও এতে এসে গেছে আর এটাও খুব সম্ভব যে, এটা অনেকগুলি হাদীসের সমষ্টি হবে, কিংবা স্বপ্ন অথবা মি'রাজ ছাড়া অন্য কোন ঘটনার রিওয়াইয়াত হবে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

স্বয়ং উম্মে হানী (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) আমার বাড়ী হতেই মি'রাজ করানো হয়। এ রাত্রে তিনি এশার নামাযের পর আমার বাড়ীতেই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তিনিও ঘুমিয়ে পড়েন এবং আমরাও সবাই ঘুমিয়ে পড়ি। ফজর হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা তাকে জাগ্রত করি। তারপর তাঁর সাথেই আমরা ফজরের নামায আদায় করি। এরপর তিনি বলেনঃ "হে উম্মে হানী (রাঃ)! আমি তোমাদের সাথেই এশার নামায আদায় করেছি এবং এর মাঝে আল্লাহ তা'আলা আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছিয়েছেন এবং আমি সেখানে নামাযও পড়েছি।"[22]

হযরত উম্মে হানী (রাঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহর (সঃ) মে'রাজ আমার এখান থেকেই হয়েছিল। আমি রাত্রে তাকে সব জায়গাতেই খোঁজ করি, কিন্তু কোথায়ও পাই নাই। তখন আমি ভয় পেলাম যে, না জানি হয়তো তিনি কুরায়েশদের প্রতারণায় পড়েছেন। কিন্তু পরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বর্ণনা করেনঃ "হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমার নিকট আগমন করেছিলেন এবং আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে চলেন। দরজার উপর একটি জন্তু দাড়িয়েছিল যা খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড়। তিনি আমাকে ওর উপর সওয়ার করিয়ে দেন। অতঃপর আমরা বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছে যাই। হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) আমি দেখতে পাই যিনি স্বভাব চরিত্রে ও আকৃতিতে সম্পূর্ণরূপে আমার সাথেই সাদৃশ্যযুক্ত ছিলেন। হযরত মুসার (আঃ) সাথেও আমাদের দেখা হয়। যিনি ছিলেন লম্বা এবং চুল ছিল সোজা। তাকে দেখতে অনেকটা শানওয়া গোত্রের লোকদের মত। অনুরূপভাবে হযরত ঈসার (আঃ) সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয় যিনি ছিলেন মধ্যমাকৃতির লোক। তার দেহের রঙ ছিল সাদা লাল মিশ্রিত। তিনি দেখতে অনেকটা উরওয়া ইবনু মাসউদ সাকাফীর মত। দাজ্জালকেও আমি দেখতে পাই। তার একটি চক্ষু নষ্ট ছিল। তাকে দেখতে ঠিক কুতানা ইবনু আবদিল উযযার মত।"

এটুকু বলার পর তিনি বলেনঃ "আচ্ছা, আমি যাই এবং যা যা দেখেছি, কুরায়েশদের নিকট বর্ণনা করবো।" আমি তখন তাঁর কাপড়ের বর্ডার টেনে ধরলাম এবং আরয করলামঃ আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যে, আপনি এটা আপনার কওমের সামনে বর্ণনা করবেন না, তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলবে। তারা আপনার কথা মোটেই বিশ্বাস করবে না। আপনি তাদের কাছে গেলে তারা আপনার সাথে বে-আদবী করবে। কিন্তু তিনি ঝট্‌কা মেরে তাঁর অঞ্চল আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলেন এবং সরাসরি কুরায়েশদের সমাবেশে গিয়ে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলেন। তার একথা শুনে জুবাইর ইবনু মুতইম বলতে শুরু করলোঃ "দেখো, আজ আমরা জানতে পারলাম যে, যদি তুমি সত্যবাদী হতে তবে আমাদের মধ্যে বসে থেকে এরূপ কথা

---

[22] এই হাদীসের কালবী নামক একজন বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। কিন্তু আবু ইয়ালা (রঃ) অন্য সনদে এটাকে খুব ফলাও করে বর্ণনা করেছেন।

বলতে না।” একটি লোক বললোঃ “আচ্ছা বলতো, পথে আমাদের যাত্রীদলের সাথে দেখা হয়েছিল কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “হা, তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল যা তারা খোঁজ করছিল।” আর একজন বললোঃ “অমুক গোত্রের উটও কি রাস্তায় দেখেছিলে?” তিনি জবাবে বলেনঃ “হা, তাদেরকেও দেখেছিলাম। তারা অমুক জায়গায় ছিল। তাদের মধ্যে লাল রং এর একটি উষ্ট্রীও ছিল যার পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাদের কাছে একটি বড় পেয়ালায় পানি ছিল যার থেকে আমি পানও করেছি।” তারা বললোঃ “আচ্ছা, তাদের উটগুলির সংখ্যা বল। তাদের মধ্যে রাখাল কে ছিল?” এ সময়েই আল্লাহ তা’আলা এ যাত্রীদলকে তার সামনে করে দেন। সুতরাং তিনি উটগুলির সংখ্যাও বলে দেন এবং রাখালদের নামও বলে দেন। তাদের মধ্যে একজন রাখাল ছিল ইবনু আবি কুহাফা। তিনি একথাও বলে দেন যে, কাল সকালে তারা সানিয়্যাহ নামক স্থানে পৌঁছে যাবে। তখন ঐ সময় অধিকাংশ লোক পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে সানিয়্যাহতে পৌঁছে গেলেন। গিয়ে দেখলো যে, সত্যি এ যাত্রীদল সেখানে এসে গেছে। তাদেরকে তারা জিজ্ঞেস করলোঃ “তোমাদের উট হারিয়ে গিয়েছিল কি?” তারা উত্তর দিলোঃ “ঠিকই হারিয়ে গিয়েছিল বটে।” দ্বিতীয় যাত্রীদলকে তারা প্রশ্ন করলোঃ “কোন লাল রঙ এর উটের পা কি ভেঙ্গে গেছে?” তারা জবাবে বললোঃ “হা, এটাও সঠিকই বটে” আবার তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ “তোমাদের কাছে একটি পানির বড় পেয়ালা ছিল কি?” জবাবে আবূ বকর নামক একটি লোক বললেনঃ “হা, আল্লাহর শপথ! আমি নিজেই তো ওটা রেখেছিলাম। তার থেকে না তো কেউ পানি পান করছে, না তা ফেলে দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সঃ) সত্যবাদী।” এ কথা বলেই তিনি তার উপর ঈমান আনলেন। আর সেদিন তার নাম সিদ্দীক রাখা হলো।

এই সমুদয় হাদীস জানার পর, যে হাদীসগুলির মধ্যে সহীহও রয়েছে, হাসানও রয়েছে, দুর্বলও রয়েছে, কমপক্ষে এটুকুতো অবশ্যই জানা গেছে যে, রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। আর এটাও জানা গেল যে, এটা শুধুমাত্র একবারই হয়, যদিও এটা বর্ণনাকারীগণ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করেছেন এবং এতে কিছু কম বেশীও রয়েছে। এটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। কেননা, নবীগন ছাড়া ভুল ক্রটি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত কে আছে? কেউ কেউ ঐ ধরনের প্রত্যেক রিওয়াইয়াতকে এক একটি পৃথক ঘটনা বলেছেন। কিন্তু এ লোকগুলি বহু দূরে বেরিয়ে গেছেন এবং অসাধারণ কথা বলেছেন। তারা অজানা স্থানে গমন করেছেন। তবুও বর্ণনায় ক্রমিক তালিকা পেশ করেছেন এবং এতে তারা বেশ গর্ববোধ করেছেন। তা এই যে, একবার রাসূলুল্লাহকে (সঃ) মক্কা হতে শুধু বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়। দ্বিতীয়বার মক্কা থেকে আসমান পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়। তৃতীয়বার ভ্রমণ করানো হয় মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এবং বায়তুল মুকাদ্দাস হতে আসমান পর্যন্ত। কিন্তু এই

উক্তিটিও খুবই দূরের উক্তি এবং খুবই দুর্বল উক্তি। পূর্ব যুগীয় মনীষীদের কেউই এই উক্তি করেন নাই। যদি এরূপ হতো তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেই খুলে খুলে এটা বর্ণনা করতেন এবং বর্ণনাকারী তার থেকে এটা বার বার হওয়ার কথা রিওয়াইয়াত করতেন।

হযরত যুহরীর (রঃ) উক্তি অনুযায়ী মি'রাজের এই ঘটনাটি হিজরতের এক বছর পূর্বে ঘটেছিল। উরওয়াও (রঃ) একথাই বলেন। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এটা হিজরতের ছ'মাস পূর্বের ঘটনা। সত্য কথা যে, এটা হিজরতের ছ'মাস পূর্বের ঘটনা। সত্য কথা এটাই যে, রাসূলুল্লাহকে (সঃ) স্বপ্নের অবস্থায় নয়, বরং জাগ্রত অবস্থায় মক্কা হতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়। এ সময় তিনি বুরাকের উপর সওয়ার ছিলেন। মসজিদে কুদ্সের দরজার উপর তিনি বুরাকটিকে বাধেন এবং ভিতরে গিয়ে ওর কিবলামুখী হয়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদ হিসেবে দু'রাকআত নামায আদায় করেন। তারপর মি'রাজ আনয়ন করা হয়, যাতে শ্রেণী বিভাগ ছিল এবং এটা সোপান হিসেবে। তাতে করে তাকে দুনিয়ার আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এইভাবে তাকে সাতটি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। প্রত্যেক আসমানে আল্লাহর নৈকট্যলাভকারীদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। নবীদের সাথে তাদের শ্রেণী মোতাবেক সালামের আদান প্রদান হয়। ষষ্ঠ আকাশে হযরত মুসা কালীমুল্লাহর (আঃ) সাথে এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি সমান্তরালে পৌঁছেন যেখানে তিনি ভাগ্য লিখনের কলমের শব্দ শুনতে পান। তিনি সিদরাতুল মুনতাহাকে দেখেন যেখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ছেয়েছিল। সোনার ফড়িং এবং বিভিন্ন প্রকারের রঙ সেখানে দেখা যাচ্ছিল। ফেরেশতাগণ কর্তৃক চারদিক ভ্রমণ করানো হয়। তৃতীয়বার ভ্রমণ করানো হয় মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এবং বায়তুল মুকাদ্দাস হতে আসমান পর্যন্ত। কিন্তু এই উক্তিটিও খুবই দূরের উক্তি এবং খুবই দুর্বল উক্তি। পূর্ব যুগীয় মনীষীদের কেউই এই উক্তি করেন নাই। যদি এরূপ হতো তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেই খুলে খুলে এটা বর্ণনা করতেন। এবং বর্ণনাকারী তার থেকে এটা বারবার হওয়ার কথা রিওয়াইয়াত করতেন।

হযরত যুহরীর (রঃ) উক্তি অনুযায়ী মি'রাজের এই ঘটনাটি হিজরতের এক বছর পূর্বে ঘটেছিল। উরওয়াও (রঃ) -এ কথাই বলেন যে, রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) স্বপ্নের অবস্থায় নয়, বরং জাগ্রত অবস্থায় মক্কা হতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়। এ সময় তিনি বুরাকের উপর সওয়ার ছিলেন। মসজিদে কুদ্সের দরজার উপর তিনি বুরাকটিকে বাধেন এবং ভিতরে গিয়ে ওর কিবলামুখী হয়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদ হিসেবে দু'রাকআত নামায আদায় করেন। তারপর মি'রাজ আনয়ন করা হয়, যাতে শ্রেণী বিভাগ ছিল এবং এটা সোপান হিসেবে। তাতে করে তাকে

দুনিয়ার আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এইভাবে তাকে সাতটি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। প্রত্যেক আসমানে আল্লাহর নৈকট্যলাভকারীদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। নবীদের সাথে তাদের শ্রেণী মোতাবেক সালামের আদান প্রদান হয়। ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা কালীমুল্লাহর (আঃ) সাথে এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি ভাগ্য লিখনের কলমের শব্দ শুনতে পান। তিনি সিদরাতুল মুনতাহাকে দেখেন যেখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ছেয়েছিল। সোনার ফড়িং এবং বিভিন্ন প্রকারের রঙ সেখানে দেখা যাচ্ছিল। ফেরেশতাগণ চারদিক থেকে ওটাকে পরিবেষ্টন করে ছিলেন। সেখানে তিনি হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) তাঁর আসল রূপে দেখতে পান যাঁর ছ'শটি পালক ছিল। সেখানে তিনি সবুজ রঙ এর “রফরফ”[23] দেখেছিলেন যা আকাশের প্রান্ত সমূহকে ঢেকে রেখেছিল।

তিনি বায়তুল মা’মুর যিয়ারত করেন যাতে হযরত খলীলুল্লাহ (আঃ) হেলান লাগিয়ে বসেছিলেন। সেখানে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা আল্লাহর ইবাদতের জন্যে যেয়ে থাকেন। কিন্তু একদিন যে দল যান, কিয়ামত পর্যন্ত আর তাদের সেখানে যাওয়ার পালা পড়ে না। তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেন। এখানে পরম করুণাময় আল্লাহ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেন এবং পরে তা কমাতে কমাতে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত রেখে দেন। এটা ছিল তার বিশেষ রহমত। এর দ্বারা নামাযের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজীলত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অতঃপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং সমস্ত নবীও (আঃ) অবতরণ করেন। সেখানে তিনি তাদের সকলকেই নামায পড়ান, যখন নামাযের সময় হয়ে যায়। সম্ভবতঃ ওটা ছিল এ দিনের ফজরের নামায। তবে কোন কোন গুরুজনের উক্তি এই যে, তিনি নবীদের ইমামতি করেছিলেন আসমানে। কিন্তু বিশুদ্ধ রিওয়াইয়াত দ্বারা এটা প্রকাশিত হয় যে, এটা বায়তুল মুকাদ্দাসের ঘটনা। কোন কোন রিওয়াইয়াতে আছে যে, যাওয়ার পথে তিনি এ নামায পড়িয়েছিলেন।

কিন্তু প্রকাশ্য কথা এই যে, ফিরবার পথে তিনি ইমামতি করেছিলেন, এর একটি দলীল তো এই যে, আসমান সমূহে নবীদের সঙ্গে যখন তার সাক্ষাৎ হয়, তখন প্রত্যেকের সম্পর্কেই হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “ইনি কে?” যদি আগমনের পথে বায়তুল মুকাদ্দাসেই তিনি তাঁদের ইমামতি করে থাকতেন পড়ে তাঁদের সম্পর্কে এই জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন কি ছিল? দ্বিতীয় দলীল এই যে, সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য তো উচুতে জনাব বারী তা’আলার সামনে হাজির হওয়া। তাহলে স্পষ্টতঃ এটাই ছিল সবচেয়ে অগ্রগণ্য। যখন এটা হয়ে গেল এবং তার উপর ও তার উম্মতের উপর এ রাত্রে যে ফরজ নামায নির্ধারিত হওয়ার ছিল সেটাও হয়ে গেল তখন তার স্বীয় নবী ভাইদের সাথে একত্রিত হওয়ার সুযোগ হলো। আর এই নবীদের

[23] মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যার উপর আরোহণ করেছিলেন ওটাই রফরফ।

সামনে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাদের ইমামতি করতে তার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তখন আরোহণ করে রাত্রির অন্ধকারেই ফজরের কিছু পূর্বে তিনি মক্কা শরীফে পৌঁছে গেলেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহরই রয়েছে।

এখন এটা যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার সামনে দুধ ও মধু বা দুধ ও শরাব অথবা দুধ ও পানি পেশ করা হয়, এই চারটি জিনিসই ছিল, এগুলি সম্পর্কে রিওয়াইয়াত সমূহে এটাও রয়েছে যে, এটা হচ্ছে বায়তুল মুকাদ্দাসের ঘটনা, আবার এও রয়েছে যে, এটা আসমান সমূহের ঘটনা। কিন্তু এটা হতে পারে যে, এই দুই জায়গাতেই এ জিনিসগুলি তার সামনে হাজির করা হয়েছিল। কারণ, যেমন কোন আগন্তুকের সামনে আতিথ্য হিসেবে কোন জিনিস রাখা হয়, এটাও এরূপই ছিল। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আবার এ ব্যাপারেও লোকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) এই মে'রাজ দেহ ও রূহ সমেত ছিল, না শুধু আধ্যাত্মিক রূপে ছিল? অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম তো এ কথাই বলেন যে, দেহ ও আত্মাসহ তার মি'রাজ হয়েছিল এবং হয়েছিল আবার জাগ্রত অবস্থায়, স্বপ্নের অবস্থায় নয়।

হা, তবে এটা কেউ অস্বীকার করেন না যে, প্রথমে স্বপ্নে রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) এই জিনিস গুলিই দেখানো হয়েছিল। তিনি স্বপ্নে যা দেখতেন অনুরূপভাবে জাগ্রত অবস্থাতেও এগুলি তাকে দেখানো হতো। এর বড় দলীল এক তো এই যে, এই ঘটনাটি বর্ণনা করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন। এই ধরনের বর্ণনারীতির দাবী এই যে, এরপরে যা বর্ণনা করা হবে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি এটাকে স্বপ্নের ঘটনা মেনে নেয়া হয় তবে স্বপ্নে এ সব জিনিস দেখে নেয়া তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যে, তা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই স্বীয় অনুগ্রহ ও ক্ষমতার প্রকাশ হিসেবে নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করবেন। আবার এটা যদি স্বপ্নের ঘটনা হতো তবে কাফিররা এভাবে এতো তাড়াতাড়ি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করতো না। কেননা, কেউ যদি তার স্বপ্নে দেখা কিছু বিস্ময়কর জিনিস বর্ণনা করে তবে শ্রোতাদের তার কথায় উত্তেজিত হওয়া এবং কঠিনভাবে তা অস্বীকার করার কোনই কারণ থাকে না। তা ছাড়া যে সবলোক এর পূর্বে ঈমান এনেছিল এবং তার রিসালাত কবুল করে নিয়েছিল, মি'রাজের ঘটনা শুনে তাদের ইসলাম থেকে ফিরে আসার কি কারণ থাকতে পারে? এর দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করেন নাই। তারপর কুরআন কারীমের بِعَبْدِهِ শব্দের উপর চিন্তা গবেষণা করলে বুঝা যাবে যে عَبْدٌ এর প্রয়োগ দেহ ও আত্মা এই দু'এর সমষ্টির উপর হয়ে থাকে।

এরপর أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا, আল্লাহপাকের এই উক্তি এটাকে আরো পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে, তিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রির সামান্য অংশের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই দেখাকে লোকদের পরীক্ষার কারণ বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِىٓ أَرَيْنَـٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ (১৭:৬০)

যদি এটা স্বপ্নই হবে তবে এতে মানুষের বড় পরীক্ষা কি এমন ছিল যে, ভবিষ্যতের হিসেবে বর্ণনা করা হতো? হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) এই দেখা ছিল চোখের দেখা।[24]

স্বয়ং কুরআন বলেঃ

مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (৫৩:১৭)

অর্থাৎ "চক্ষু টলেও নাই এবং বিপথগামীও হয় নাই।" স্পষ্ট কথা যে,بَصَر অর্থাৎ চক্ষু বা দৃষ্টি মানুষের সত্তার একটি বড় গুণ, শুধু আত্মা নয়। তারপর বুরাকের উপর সওয়ার
করিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়াও এরই দলীল যে, এটা জাগ্রত অবস্থার ঘটনা এবং এটা তার সশরীরে ভ্রমণ। শুধু রূহের জন্যে সওয়ারীর কোন প্রয়োজন ছিল না। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

অন্যেরা বলেন যে, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) এই মি'রাজ ছিল শুধু আত্মার দৈহিক নয়। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) লিখেছেনঃ "হযরত মুআ'বিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহর (সঃ) দেহ অদৃশ্য হয় নাই, বরং তাঁর মি'রাজ ছিল আত্মার, দেহের নয়।" তার এই উক্তিকে অস্বীকার করা হয় নাই। কেননা, হযরত হাসান (রঃ) বলেনঃ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ..... الخ এই আয়াত বর্ণিত হয়েছিল এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে খবর দিয়েছেন যে, তিনি বলেছিলেনঃ "আমি স্বপ্নে তোমাকে (হযরত ইসমাঈল (আঃ)) কে যবাহ করতে দেখেছি, সুতরাং তুমি চিন্তা কর, তোমার মত কি?" তারপর এই অবস্থাই থাকে। অতএব, এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, নবীদের (আঃ) কাছে জাগ্রত অবস্থায়ও ওয়াহী আসে এবং স্বপ্নেও আসে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেনঃ "আমার চক্ষু ঘুমায় বটে, কিন্তু অন্তর জেগে থাকে।" এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এ সবের মধ্যে সত্য কোনটি? তিনি

[24] এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেছেন।

জানেন এবং অনেক কিছু দেখেন। ঘুমন্ত বা জাগ্রত যে অবস্থাতেই তিনি থাকুন না কেন সবই হক ও সত্য। এটা তো ছিল মুহাম্মদ ইবনু ইসহাকের (রঃ) উক্তি। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) এটাকে বিভিন্নভাবে খণ্ডন করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা কুরআন কারীমের শব্দের সরাসরি উল্টো উক্তি। অতঃপর তিনি এর বিপরীত অনেক কিছু দলীল কায়েম করেছেন। এ সব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

এই বর্ণনায় এক অতি উত্তম ও যবরদস্ত উপকার এ রিওয়াইয়াত দ্বারা হয়ে থাকে যা হাফিজ আবূ নঈম ইসবাহানী (রঃ) কিতাবুদ দালাইলিন নবুওয়াহতে আনয়ন করেছেন। রিওয়াইয়াতটি এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন দাহ্ইয়া ইবনু খালীফাকে (রাঃ) একটি পত্র দিয়ে দূত হিসেবে রোমক সম্রাট কায়সারের নিকট প্রেরণ করেন তখন তিনি সম্রাটের নিকট পৌঁছলে সম্রাট সিরিয়ায় অবস্থানরত আরব বণিকদেরকে তাঁর দরবারে হাজির করেন। তাঁদের মধ্যে আবু সুফিয়ান সখর ইবনু হারব (রাঃ) ছিলেন এবং তার সাথে মক্কার অন্যান্য কাফিররাও ছিল। তারপর তিনি তাদেরকে অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন যা সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবু সুফিয়ান (রাঃ) এই চেষ্টাই করে আসছিলেন যে, কি করে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) আকর্ষণ না থাকে। তিনি নিজেই বলেছেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি মিথ্যা আরোপ করতে এবং তার প্রতি অপবাদ দিতে শুধুমাত্র এই ভয়েও কার্পণ্য করেছিলাম যে,যদি তাঁর প্রতি আমি কোন মিথ্যা আরোপ করি তবে আমার সঙ্গীরা এর প্রতিবাদ করবে এবং সম্রাটের কাছে আমি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে যাবো। আর এটা হবে আমার জন্য বড় লজ্জার কথা। তৎক্ষণাৎ আমার মনে একটা ধারণা জেগে উঠলো এবং আমি বললামঃ "হে সম্রাট! শুনুন, আমি একটি ঘটনা বর্ণনা করছি যার দ্বারা আপনার সামনে এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়বে যে, মুহাম্মদ (সঃ) বড়ই মিথ্যাবাদী লোক। একদিন সে বর্ণনা করেছে যে, একদা রাত্রে সে মক্কা থেকে বের হয়ে আপনার এই মসজিদে অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে কুদ্স পর্যন্ত গিয়েছে এবং ফজরের পূর্বেই মক্কায় ফিরে এসেছে। আমার এই কথা শোনা মাত্রই বায়তুল মুকাদ্দাসের লাট পাদরী, যিনি রোমক সম্রাটের ঐ মজলিসে তার পার্শ্বে সম্মানের সাথে বসেছিলেন, বলে উঠলেনঃ "এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য ঘটনা। এ রাত্রের ঘটনা আমার জানা আছে।" তার একথা শুনে রোমক সম্রাট অত্যন্ত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান এবং আদবের সাথে জিজ্ঞেস করেনঃ "জনাব এটা আপনি কি করে জানলেন?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "শুনুন, আমার অভ্যাস ছিল এবং এটা আমি নিজের জন্যে বাধ্যতামূলক করে নিয়েছিলাম যে, যে পর্যন্ত এই মসজিদের (বায়তুল মুকাদ্দাসের) সমস্ত দরজা নিজের হাতে বন্ধ না করতাম সেই পর্যন্ত ঘুমাতাম না। ঐ রাত্রে অভ্যাস মত দরজা বন্ধ করার জন্যে আমি দাঁড়ালাম। সমস্ত দরজা ভালরূপে বন্ধ করলাম, কিন্তু একটি দরজা বন্ধ করা আমার দ্বারা কোন ক্রমেই সম্ভব হলো না। আমি খুবই শক্তি প্রয়োগ করলাম, কিন্তু কপাট স্বস্থান হতে একটুও সরলো না। তখন আমি আমার

লোকজনকে ডাক দিলাম। তারা এসে গেলে আমরা সবাই মিলে শক্তি দিলাম। কিন্তু আমাদের এই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল। আমাদের মনে হলো যে, আমরা যেন একটি পাহাড়কে ওর স্থান হতে সরাতে চাচ্ছি, কিন্তু ওটা একটুও হেলছে না বা নড়ছে না। আমি তখন একজন কাঠ মিস্ত্রীকে ডাকলাম। সে অনেকক্ষণ চেষ্টা করলো, কিন্তু পরিশেষে সেও হার মানলো এবং বললোঃ “সকালে আবার দেখা যাবে।” সুতরাং ঐ রাত্রে ঐ দরজার দুটি পাল্লা এভাবেই খোলা থেকে গেল। সকালেই আমি ঐ দরজার কাছে গিয়ে দেখি যে, ওর পার্শ্বে কোণায় যে একটি পাথর ছিল তাতে একটি ছিদ্র রয়েছে এবং জানা যাচ্ছে যে, ঐ রাত্রে কেউ সেখানে কোন জন্তু বেধে রেখেছিল, ওর চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। আমি তখন বুঝে ফেললাম যে, আজ রাত্রে আমাদের এই মসজিদকে কোন নবীর জন্যে খুলে রাখা হয়েছে এবং তিনি অবশ্যই এখানে নামায পড়েছেন। এই কথা আমি আমার লোকদেরকে বুঝিয়ে বললাম।” এটা খুবই দীর্ঘ হাদীস।

ফায়েদাঃ হযরত আবু খাত্তাব উমার ইবনু দাহইয়াহ (রঃ) তার- كتابُ التَّنوير في مولد السِّراج المُنِيرِ নামক গ্রন্থে হরযত আনাসের (রাঃ) বর্ণনার মাধ্যমে মি’রাজের হাদিসটি আনয়ন করে ওর সম্পর্কে অতি উত্তম মন্তব্য করতঃ বলেন যে, মে'রাজের হাদীসটি হলো মুতাওয়াতির। হযরত উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ), হযরত আবু যার (রাঃ), হযরত মা’লিক ইবনু সা’সা’ (রাঃ), হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ), হযরত আবু সাঈদ (রাঃ), হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ), হযরত শাদ্দাস ইবনু আউস (রাঃ), হযরত উবাই ইবনু কা’ব (রাঃ) হযরত আবদুর রহমান ইবনু কার্য্ (রাঃ) হযরত আবু হিব্বাহ্ (রাঃ), হযরত আবূ ইয়ালা (রঃ), হযরত হুযাইফা (রাঃ),হযরত বুরাইদা' (রাঃ), হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ), হযরত আবু উমামা' (রাঃ),হযরত সামনা ইবনু জুনদুব (রাঃ), হযরত আবুল খামরা' (রাঃ), হযরত সুহাইব রূমী (রাঃ), হযরত উম্মে হানী (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আসমা" (রাঃ) প্রভৃতি হতে মি'রাজের হাদীস বর্ণিত আছে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। যদিও এগুলোর মধ্যে কতকগুলি রিওয়াইয়াত সনদের দিক দিয়ে বিশুদ্ধ নয়, তথাপি মোটের উপর সঠিকতার সাথে মে'রাজের ঘটনা সাব্যস্ত করেছেন এবং মুসলমানরা সমস্টিগতভাবে এর স্বীকারোক্তিকারী। হা, তবে যিনদীক ও মুলহিদ লোকেরা এটা অস্বীকারকারী। তারা চায় যে, আল্লাহর নূরকে (দ্বীন ইসলামকে) নিজেদের মুখ দ্বারা নির্বাপিত করে, অথচ আল্লাহ নিজ নূরকে পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে ছাড়বেন, চাই কাফিররা যতই অসন্তুষ্ট হোক না কেন।

সূরা আন নাজম আয়াত- ১, তাফসীরে জাকারিয়া

وَ النَّجۡمِ اِذَا هَوٰی

ভাবার্থঃ শপথ নক্ষত্রের, যখন তা হয় অস্তিমিত।

নক্ষত্রমাত্রকেই نجم বলা হয় এবং বহুবচন نجوم [ইরাবুল কুরআন]। কখনও এই শব্দটি কয়েকটি নক্ষত্রের সমষ্টি সপ্তর্ষিমণ্ডলের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই আয়াতেও কেউ কেউ নজমের তফসীর "সুরাইয়া" অর্থাৎ সপ্তর্ষিমণ্ডল দ্বারা করেছেন। সুদ্দী বলেন, এর অর্থ শুক্রগ্রহ (Venus)। [কুরতুবী]। هوى শব্দটি পতিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। নক্ষত্রের পতিত হওয়ার মানে অস্তমিত হওয়া। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নক্ষত্রের কসম খেয়ে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওহী সত্য, বিশুদ্ধ ও সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে। [আদওয়াউল বায়ান, সা'দী]

সূরা আন নাজম আয়াত- ২, তাফসীরে জাকারিয়া

مَا ضَلَّ صَاحِبُکُمۡ وَ مَا غَوٰی

ভাবার্থঃ তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়,

মূল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে صَاحِبُكُمْ বা তোমাদের বন্ধু। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে এবং কুরাইশদের সম্বোধন করা হয়েছে। আরবী ভাষায় صَاحِب বলতে বন্ধু, সাথী, নিকটে অবস্থানকারী এবং সাথে উঠা-বসা করে এমন লোককে বুঝায়। এ স্থলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম অথবা নবী শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে "তোমাদের সঙ্গী" বলে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে থেকে আগত কোন অপরিচিত ব্যক্তি নন, যার সত্যবাদিতায় তোমরা সন্দিগ্ধ হবে। বরং তিনি তোমাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। [দেখুন: কুরতুবী; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

সূরা আন নাজম আয়াত- ৩, তাফসীরে জাকারিয়া

وَ مَا یَنۡطِقُ عَنِ الۡهَوٰی

ভাবার্থঃ আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না।

অর্থাৎ সেসব কথা তার মনগড়া নয় কিংবা তার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ঐ সবের উৎস নয়। তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে তার ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং হচ্ছে। একইভাবে ইসলামের এ আন্দোলন, তাওহীদের এ শিক্ষা, আখেরাত, হাশর-নাশর এবং কাজকর্মের প্রতিদানের এ খবর মহাবিশ্ব ও মানুষ সম্পর্কে এসব সত্য ও তথ্য এবং পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য যেসব নীতিমালা তিনি পেশা করছেন এসবও তার নিজের রচিত দর্শন নয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]।

সূরা আন নাজম আয়াত- ৪, তাফসীরে আহসানুল বায়ান

اِنۡ هُوَ اِلَّا وَحۡیٌ یُّوۡحٰی

ভাবার্থঃ তা তো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।

অর্থাৎ, তিনি পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী কি করে হতে পারেন?! তিনি তো আল্লাহর প্রত্যাদেশ ছাড়া মুখই খুলেন না। এমনকি রহস্য ও হাসি-ঠাট্টার সময়ও তাঁর পবিত্র জবান থেকে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না (তিরমিযীঃ বির্র্ অধ্যায়) অনুরূপ ক্রোধের সময়ও তাঁর স্বীয় আবেগ ও উত্তেজনার উপর এত নিয়ন্ত্রণ ছিল যে, তাঁর জবান থেকে কোন কথা বাস্তবের বিপরীত বের হয়নি। (আবূ দাউদঃ শিক্ষা অধ্যায়)

সূরা আন নাজম আয়াত- ৫, তাফসীরে জাকারিয়া

عَلَّمَهٗ شَدِیۡدُ الۡقُوٰی ۙ

ভাবার্থঃ তাকে শিক্ষা দান করেছেন প্রচণ্ড শক্তিশালী,

অর্থাৎ তাকে শিক্ষাদানকারী কোন মানুষ নয়, যা তোমরা মনে করে থাকো। মানব সত্তার ঊর্ধ্বের একটি মাধ্যম থেকে তিনি এ জ্ঞান লাভ করছেন। তাফসীরকারদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ ব্যাপারে একমত যে, “মহাশক্তির অধিকারী” এর অর্থ জিবরীল আলাইহিস সালাম। [ফাতহুল কাদীর]

সূরা আন নাজম আয়াত- ৬, তাফসীরে জাকারিয়া

ذُوۡ مِرَّۃٍ ؕ فَاسۡتَوٰی

ভাবার্থঃ সৌন্দর্যপূর্ণ সত্তা(১)। অতঃপর তিনি স্থির হয়েছিলেন(২),

(১) এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ফেরেশতাগণ অত্যন্ত সুন্দর। তারা যেমন সুন্দর তাদের চরিত্রও তেমনি। তাই তারা কোন খারাপ সুরত গ্রহণ করেন না। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিন সার্বিকভাবে তারা সুন্দর। কোন কোন মুফাসসির مرة শব্দটির অর্থ করেছেন, শক্তিশালী হওয়া। জিবরাঈলের অধিক শক্তি বর্ণনা করার জন্যে এটাও তারই বিশেষণ। এতে করে এই ধারণার অবকাশ থাকে না, ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাজে কোন শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আবার কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, বিবেকবান। আবার কেউ কেউ অর্থ করেছেন, শারিরীক ও মানসিক সুস্থতা। এসবগুলোই মূলত: ফেরেশতাদের গুণ। [দেখুন: কুরতুবী]

(২) এর অর্থ সোজা হয়ে গেলেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য যদি জিবরীল আলাইহিস সালাম হয়, তখন অর্থ হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীলকে যখন প্রথম দেখেন, তখন তিনি আকাশ থেকে নিচে অবতরণ করছিলেন। অবতরণের পর তিনি উর্ধ্ব দিগন্তে সোজা হয়ে বসে যান। রাসূলকে দেখা দেওয়ার পর পুনরায় তিনি তার জায়গায় ফিরে যান। অথবা সোজা হয়ে যাওয়ার অর্থ জিবরীল তার সৃষ্ট সঠিক রূপে দাঁড়িয়ে গেলেন। যে প্রকৃত রূপে আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি সে প্রকৃত রূপে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে উপস্থিত হলেন। আর যদি এখানে সোজা হয়ে যাওয়া দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য নেয়া হয় তখন আয়াতের অর্থ হবে, তারপর কুরআন রাসূলের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। আর যদি এখানে সোজা হওয়া দ্বারা আল্লাহকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়ে থাকে তখন এর অর্থ হবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের উপর উঠলেন। এ সব তাফসীর সবগুলিই সালফে সালেহীন থেকে বর্ণিত আছে এবং সবগুলিই উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

সূরা আন নাজম আয়াত- ৭, তাফসীরে জাকারিয়া

وَ هُوَ بِالۡاُفُقِ الۡاَعۡلٰی ؕ

ভাবার্থঃ আর তিনি ছিলেন ঊর্ধ্বদিগন্তে,

এ আয়াতে জিবরীলকে আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। দিগন্ত অর্থ আসমানের পূর্ব প্রান্ত যেখানে সূর্য উদিত হয় এবং দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ে। সূরা আত-তাকভীরের ২৩ আয়াতে একেই পরিষ্কার দিগন্ত বলা হয়েছে। দুটি আয়াত থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমবার যখন জিবরীল আলাইহিস সালামকে

দেখেন তখন তিনি আসমানের পূর্ব প্রান্ত থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মূলত: মহাশক্তিশালী, সহজাত শক্তিসম্পন্ন বা প্রজ্ঞাবান, সৌন্দর্যমণ্ডিত, সোজা হওয়া, এবং নিকটবর্তী হওয়া এগুলো সব জিবরীলের বিশেষণ। এই তফসীরের পক্ষে অনেক সঙ্গত কারণ রয়েছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও সূরা আন-নাজম সম্পূর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্যতম। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় সর্বপ্রথম যে সূরা প্রকাশ্যে পাঠ করেন তা সূরা আন-নাজম। বাহ্যত মে'রাজের ঘটনা এরপরে সংঘটিত হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব আয়াতের যে তফসীর করেছেন, তাতে জিবরীলকে দেখার কথা উল্লেখিত আছে। ইমাম শা'বী তার উস্তাদ মাসরূক থেকে বর্ণনা করেন- তিনি একদিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার কাছে ছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। মাসরূক বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, (وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ) এবং (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, মুসলিমদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন, আয়াতে যাকে দেখার কথা বলা হয়েছে, সে জিবরীল আলাইহিস সালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মাত্র দু’বার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। আয়াতে বর্ণিত দেখার অর্থ এই যে, তিনি জিবরীলকে আকাশ থেকে ভূমির দিকে অবতরণ করতে দেখেছেন। তার দেহাকৃতি আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল।[25]

অন্য বর্ণনায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেনঃ এই আয়াত সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, আপনি আপনার পালনকর্তাকে দেখেছেন কি? তিনি বললেনঃ না, বরং আমি জিবরীলকে নিচে অবতরণ করতে দেখেছি। [মুসনাদে আহমাদ: ৬/২৩৬] অনুরূপভাবে শায়বানী বর্ণনা করেন যে, তিনি আবু যরকে এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন, তিনি জওয়াবে বলেনঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীলকে ছয়শত ডানাবিশিষ্ট দেখেছেন। [বুখারী: ৪৮৫৬] ইবনে জারীর রাহেমাহুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে-মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীলকে রফরফের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। তাঁর অস্তিত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে রেখেছিল। [তাফসীর তাবারী: ৩২৪৭০]

---

[25] [বুখারী: ৪৬১২, ৪৮৫৫, মুসলিম: ১৭৭/২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, তিরমিযী: ৩০৬৮, মুসনাদে আহমাদ: ৬/২৪১]

এ সব বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সূরা নাজমের উল্লেখিত আয়াতসমূহ দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বলে জিবরীলকে দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বোঝানো হয়েছে। আয়েশা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু যর গেফারী, আবু হুরায়রা প্রমুখ সাহাবীর এই উক্তি। তাই ইবনে-কাসীর আয়াতসমূহের তফসীরে বলেনঃ আয়াতসমূহে উল্লেখিত দেখা ও নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ জিবরীলকে দেখা ও জিবরাঈলের নিকটবর্তী হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন এবং দ্বিতীয়বার মে'রাজের রাত্রিতে সিদরাতুল-মুন্তাহার নিকটে দেখেছিলেন। প্রথমবারে দেখা নবুওয়তের সম্পূর্ণ প্রাথমিক যমানায় হয়েছিল।
তখন জিবরীল সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতসমূহের প্রত্যাদেশ নিয়ে প্রথমবার আগমন করেছিলেন। এরপর একদিন জিবরীল আলাইহিস সালাম মক্কার উন্মুক্ত ময়দানে তার আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। তার ছয়শত বাহু ছিল এবং তিনি গোটা দিগন্তকে ঘিরে রেখেছিলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসেন এবং তাকে ওহী পৌছান। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে জিবরাঈলের মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে তার সুউচ্চ মর্যাদার স্বরূপ ফুটে ওঠে। সারকথা এই যে, এই প্রথম দেখা এ জগতেই মক্কার দিগন্তে হয়েছিল। দ্বিতীয়বার দেখার কথা (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ) আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। মে'রাজের রাত্রিতে এই দেখা হয়।
উল্লেখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে সুস্পষ্টভাবে এটাই বলা যায় যে, সূরা আন-নাজমের শুরুভাগের আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার কথা আলোচিত হয়নি; বরং জিবরীলকে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জিবরীলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিজস্ব আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন। প্রথমবার নবুওয়াতের প্রারম্ভে। আর দ্বিতীয়টি মি'রাজের রাত্রিতে, সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে। [দেখুন: বুখারী: ৪৮৫৫, ৪৮৫৬]

সূরা আন নাজম আয়াত- ৮, তাফসীরে আহসানুল বায়ান

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى

ভাবার্থঃ অতঃপর সে তার (রসূল)এর নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী।

অর্থাৎ, অতঃপর যমীনে অবতরণ করলেন এবং ধীরে ধীরে নবী করীম (সাঃ)-এর নিকটবর্তী হলেন।

সূরা আন নাজম আয়াত- ৯, তাফসীরে জাকারিয়া

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

ভাবার্থঃ ফলে তাদের মধ্যে দু ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম।

دَنَا **শব্দের অর্থ নিকটবর্তী হল এবং** فَتَدَلّٰى **শব্দের** অর্থ ঝুলে গেল। অর্থাৎ ঝুঁকে পড়ে নিকটবর্তী হল। ধনুকের কাঠ এবং এর বিপরীতে ধনুকের সুতার মধ্যবর্তী ব্যাবধানকে قاب বলা হয়। এই ব্যবধান আনুমানিক একহাত হয়ে থাকে। [কুরতুবী] আলোচ্য আয়াতসমূহে জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, তিনি যে ওহী পৌঁছিয়েছেন তা শ্রবণে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। [দেখুন: কুরতুবী]

সূরা আন নাজম আয়াত- ১০, তাফসীরে জাকারিয়া

فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى

ভাবার্থঃ তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন।

এখানে أَوْحٰى (বা ওহী প্রেরণ করেন) ক্রিয়াপদের কর্তা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এবং عَبْدُهُ (বা তার বান্দা) এর সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলাকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জিবরীল আলাইহিস সালাম-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি ওহী নাযিল করলেন। [দেখুন: আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর, তাবারী]। এক হাদীসে এসেছে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনটি জিনিস দেয়া হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, সূরা আল-বাকারাহ এর শেষ আয়াতসমূহ এবং তার উম্মতের মধ্যে যারা আল্লাহর সাথে শির্ক করবে না তাদের জন্য ক্ষমার ঘোষণা। [মুসলিম: ১৭৩]

সূরা আন নাজম আয়াত- ১১, তাফসীরে জাকারিয়া

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى

ভাবার্থঃ যা তিনি দেখেছেন, তার অন্তঃকরণ তা মিথ্যা বলেনি;

فؤاد শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ। উদ্দেশ্য এই যে, চক্ষু যা কিছু দেখেছে, অন্তঃকরণও তা যথাযথ উপলব্ধি করতে কোন ভুল করেনি। (مَا رَأَىٰ) শব্দের অর্থ যা কিছু দেখেছে। এখানে উদ্দেশ্য তিনি জিবরীল আলাইহিস সালাম-কে আসল আকৃতিতে দেখেছেন। [মুয়াস্‌সার, কুরতুবী]
এ আয়াতে فؤاد বা অন্তঃকরণকে উপলব্ধি করার কর্তা করা হয়েছে। অথচ অনেকের মতে উপলব্ধি করা বোধশক্তি বা عقل এর কাজ। [আততাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, উপলব্ধির আসল কেন্দ্র অন্তঃকরণ। তাই কখনও বোধশক্তিকেও ‘কলব’ (অন্তঃকরণ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে দেয়া হয়; যেমন (لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ) আয়াতে কলব বলে عقل বা বিবেক ও বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনের (لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا) ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

সূরা আন নাজম আয়াত- ১২

اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى

ভাবার্থঃ তিনি যা দেখেছেন তোমরা কি সে বিষয়ে তার সঙ্গে বিতর্ক করবে?

সূরা আন নাজম আয়াত- ১৩, ১৪ তাফসীরে জাকারিয়া

وَ لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى

ভাবার্থঃ আর অবশ্যই তিনি তাকে আরেকবার দেখেছিলেন।

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى

ভাবার্থঃ সিদরাতুল মুন্তাহা তথা প্রান্তবর্তী কুল গাছ এর কাছে

এর অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক জিবরীলকে দ্বিতীয়বারের মত তার আসল আকৃতিতে দেখা। [বুখারী: ৩২৩৪, মুসলিম: ১৭৪] দ্বিতীয়বারের এই দেখার স্থান সপ্তম আকাশের ‘সিদরাতুল-মুন্তাহা’ বলা হয়েছে। বলাবাহুল্য, মে'রাজের রাত্রিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সপ্তম আকাশে গমন করেছিলেন। এতে করে দ্বিতীয়বার দেখার সময়ও মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অভিধানে ‘সিদরাহ' শব্দের অর্থ বদরিকা বৃক্ষ। মুন্তাহা শব্দের

অর্থ শেষপ্রান্ত। সপ্তম আকাশে আরশের নিচে এই বদরিকা বৃক্ষ অবস্থিত। মুসলিমের বর্ণনায় একে ষষ্ঠ আকাশে বলা হয়েছে। উভয় বর্ণনার সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, এই বৃক্ষের মূল শিকড় ষষ্ঠ আকাশে এবং শাখা প্রশাখা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। সাধারণ ফেরেশতাগণের গমনাগমনের এটাই শেষ সীমা। তাই একে মুন্তাহা বলা হয়। [ইবন কাসীর; কুরতুবী; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর; ফাতহুল কাদীর]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি প্রথমে 'সিদরাতুলমুন্তাহায়' নাযিল হয় এবং এখান থেকে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়। যমীন থেকে আসমানগামী আমলনামা ইত্যাদিও ফেরেশতাগণ এখানে পৌছায় এবং এখান থেকে অন্য কোন পন্থায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয়। [মুসলিম: ১৭৩, মুসনাদে আহমাদ: ১/৩৮৭, ৪২২]

সূরা আন নাজম আয়াত- ১৫, তাফসীরে জাকারিয়া

عِنۡدَهَا جَنَّةُ الۡمَاۡوٰی

ভাবার্থঃ যার কাছে জান্নাতুল মা'ওয়া(১) অবস্থিত।

مَأْوَىٰ শব্দের অর্থ ঠিকানা, বিশ্রামস্থল। জান্নাতকে الْمَأْوَىٰ বলার কারণ এই যে এটাই মুমিনের আসল ঠিকানা। দেখুন, ফাতহুল কাদী।

সূরা আন নাজম আয়াত- ১৬, তাফসীরে জাকারিয়া

اِذۡ یَغۡشَی السِّدۡرَۃَ مَا یَغۡشٰی

ভাবার্থঃ যখন কুল গাছটিকে যা আচ্ছাদিত করার তা আচ্ছাদিত করেছিল।

অর্থাৎ যখন বদরিকা বৃক্ষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আচ্ছন্নকারী বস্তু। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন বদরিকা বৃক্ষের উপর স্বর্ণ নির্মিত প্রজাপতি চতুর্দিক থেকে এসে পতিত হচ্ছিল। [মুসলিম: ১৭৩, মুসনাদে আহমাদ: ১/৩৮৭, ৪২২] মনে হয়, আগন্তুক মেহমান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মানার্থে সেদিন বদরিকা বৃক্ষকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল। [কুরতুবী]

সূরা আন নাজম আয়াত- ১৭, তাফসীরে জাকারিয়া

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰى

ভাবার্থঃ তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি।

زاغ **শব্দটি** زيغ থেকে উদ্‌ভূত। এর অর্থ বক্র হওয়া, বিপথগামী হওয়া। আর طغى **শব্দটি** طغيان থেকে উদ্‌ভূত। এর অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু দেখেছেন, তাতে দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি।
তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন শুধু যে জিবরীলকে দেখেছেন তাও নয়। জিবরীল ছাড়াও তিনি জান্নাত দেখেছেন, সিদরাতুল মুন্তাহা দেখেছেন, সেখানে যা পতিত হচ্ছিল তাও দেখেছেন, আল্লাহর অন্যান্য নিদর্শনাবলী দেখেছেন। মোটকথা: আল্লাহ তাকে যা দেখাতে চেয়েছেন তিনি তা স্পষ্টভাবে দেখেছেন। এর বাইরে দেখতে চাননি। এটা মূলত: আল্লাহর রাসূলের একটি গুণ যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশিত পথের বাইরে একটুও যাননি। [দেখুন: কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

সূরা আন নাজম আয়াত- ১৮, তাফসীরে আহসানুল বায়ান

لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى

ভাবার্থঃ নিঃসন্দেহে সে তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল।

যেগুলোর মধ্যে জিবরীল (আঃ)-এর আসল আকৃতি, ‘সিদরাতুল মুন্তাহা’ ও প্রতিপালকের অন্যান্য মহাশক্তির কিছু নিদর্শন। যার বিস্তারিত আলোচনা মি’রাজ সংক্রান্ত হাদীসমূহে করা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

https://www.hadithbd.com/quran/tafsir/?pageNum_tafsirquran=1&totalRows_tafsirquran=62&sura=53

শবে মে'রাজ সংক্রান্ত কিছু হাদীস

বুরাকঃ ইসহাক ইবন মানসূর (রহঃ) ...... আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। মি'রাজের রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জিন পরিয়ে লাগাম লাগিয়ে বুরাক আনা হল কিন্তু সে হঠকারিতা করল। তখন জিবরীল (আঃ) বললেনঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারেও তুমি এরূপ করছ? আল্লাহর কাছে তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কেউ তোমার উপর কখনও আরোহণ করেনি। লজ্জায় বুরাকটি ঘর্মাক্ত হয় উঠল।[26]

জান্নাতের গাছঃ আবদুল্লাহ ইবন আবু যিয়াদ (রহঃ) .... ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছনঃ মে'রাজের রাতের সফরে ইবরাহীম (আঃ) এর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। তখন তিনি বলেনঃ হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন এবং তাদের জানিয়ে দিবেন যে, জান্নাতের মাটি উত্তম আর এর পানি সুমিষ্ট। তবে তা ফাঁকা ময়দান। এর ছায়া হল সুবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।[27]

নবীদের গঠনঃ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন যে, আমার নিকট ‘নাবীগনকে উপস্থিত করা হলো, তখন মূসা (আঃ) কে দেখলাম একজন মধ্যম ধরনের মানুষ, অনেকটা শানূয়াহ গোত্রীয় লোকদের ন্যায়। আর ‘ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) কে দেখলাম, তাঁর নিকটতম ব্যক্তি হলেন ‘উরওয়াহ ইবনু মাস’ঊদ। ইবরাহীম (আঃ) কে দেখলাম, তাঁর অনেকটা কাছাকাছি সদৃশ ব্যক্তি হচ্ছেন তোমাদের এ সাথী

অর্থাৎ স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। জিবরীল (‘আঃ) কে দেখলাম তাঁর কাছাকাছি সদৃশ ব্যক্তি হচ্ছেন দিহইয়া। ইবনু রুমহ-এর বর্ণনায় আছে, দিহইয়া ইবনু খলীফার ন্যায়।[28]

পুরো ঘটনা আবূ যার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত:

রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি মাক্কাতে ছিলাম। আমার ঘরের ছাদ ফাঁক করা হলো। তখন জিবরীল (আঃ) অবতরণ করলেন। তিনি আমার বুক ছিড়ে ফেললেন। এরপর তা যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন। তারপর হিকমাত ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি পাত্র আনা হলো এবং এতে তা রাখা হলো, পুনঃ তা আমার বুকে ঢেলে বুক বন্ধ করে দিলেন। এরপর আমার হাত ধরলেন এবং ঊর্ধ্বাকাশে যাত্রা করলেন। আমরা যখন প্রথম আসমানে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন জিবরীল (‘আঃ) এ আসমানের দারোয়ানকে বললেন, দরজা খুলুন, তিনি বললেন কে? বললেন, জিবরীল। দারোয়ান বললেন, আপনার সাথে কি অন্য কেউ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমার সাথে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আছেন। দারোয়ান

---

[26] এ হাদীসটি হাসান-গারীব। আবদুর রাজ্জাক (রহঃ) এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

সহীহ, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ৩১৩১ [আল মাদানী প্রকাশনী]

[27] সুনান আত তিরমিজী হাদিস নামার ৩৪৬২[ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

[28] মুসলিম শরীফ(ই.ফা. ৩২০; ই.সে. ৩৩১)

বললেন, তাঁর কাছে আপনাকে পাঠানো হয়েছিল কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর দরজা খুলে দেয়া হলো। আমরা প্রবেশ করে দেখি, এক ব্যক্তি তাঁর ডানে একদল মানুষ এবং বাঁয়ে একদল মানুষ। যখন তিনি ডান দিকে তাকান তখন হাসেন, আর যখন বাঁ দিকে তাকান তখন কাঁদেন। তিনি আমাকে বললেন, মারহাবা হে সুযোগ্য নাবী। হে সুযোগ্য সন্তান! রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি জিবরীলকে বললাম, ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি আদাম (‘আঃ) আর ডান ও বাঁয়ের এ লোকগুলো তাঁর বংশধর। ডান দিকের লোকেরা হচ্ছে জান্নাতবাসী আর বাম দিকের লোকেরা হচ্ছে জাহান্নামবাসী। আর এ কারণেই তিনি ডান দিকে তাকালে হাসেন এবং বাঁ দিকে তাকালে কাঁদেন। তারপর জিবরীল (‘আঃ) আমাকে নিয়ে ঊর্ধ্বারোহণ করলেন এবং দ্বিতীয় আসমানে পৌছলেন এবং এর দারোয়ানকে বললেন, দরজা খুলুন। তিনি প্রথম আসমানের দারোয়ানের ন্যায় প্রশ্নোত্তর করে দরজা খুলে দিলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন যে, তিনি আসমানসমূহে আদাম, ইদ্‌রীস, মূসা এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে দেখা করেছেন। আদাম (আঃ) প্রথম আসমানে এবং ইবরাহীম (আঃ) ৬ষ্ঠ আসমানে। এ ছাড়া অন্যান্য নাবীর অবস্থান সম্পর্কে এ রিওয়ায়াতে কিছু উল্লেখ নেই। আনাস (রাঃ) বলেন, যখন রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও জিবরীল (আঃ) ইদ্‌রীস (আঃ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, মারহাবা, হে সুযোগ্য নাবী! সুযোগ্য ভ্রাতা! রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? জিবরীল (আঃ) উত্তর দিলেন; ইনি ইদ্‌রীস (আঃ)। তারপর আমরা মূসা (আঃ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনিও বললেন, মারহাবা হে সুযোগ্য নাবী, সুযোগ্য ভ্রাতা! জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তিনি জবাব দিলেন, ইনি মূসা (আঃ)। তারপর আমরা ‘ঈসা (আঃ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনিও বললেন, ইনি ‘ঈসা (আঃ)। তারপর আমরা ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম তিনিও বললেন, মারহাবা হে সুযোগ্য নাবী! সুযোগ্য সন্তান! জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি ইবরাহীম (আঃ)। ইবনু শিহাব, ইবনু হায্‌ম, ইবনু ‘আব্বাস ও আবূ হাব্বাহ্ আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তারপর জিবরীল (আঃ) আমাকে নিয়ে আরো ঊর্ধ্বে চললেন। আমরা এমন এক স্তরে পৌছলাম যে তথায় আমি কলম-এর খশখশ শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। ইবনু হাযম ও আনাস ইবনু মালিক বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তখন আল্লাহ তা’আলা আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফারয করেন। আমি এ নিয়ে ফেরার পথে মূসা (আঃ)-এর সাথে দেখা হয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার প্রতিপালক আপনার উম্মাতের উপর কি ফারয করেছেন? আমি উত্তরে বললাম, তাদের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফারয করা হয়েছে। মূসা (আঃ) আমাকে বললেন, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান; কেননা

আপনার উম্মাত এতে সক্ষম হবে না। তাই আমি আল্লাহর দরবারে ফিরে গেলাম। তখন আল্লাহ এর অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আমি আবার ফিরে এসে মূসা (আঃ)-কে জানালে তিনি বললেন, না। আপনি পুনরায় ফিরে যান; কেননা আপনার উম্মাত এতেও সক্ষম হবে না। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তারপর আমি আল্লাহর দরবারে ফিরে গেলে তিনি বললেন, এ নির্দেশ পাঁচ, আর পাঁচই পঞ্চাশের সমান করে দিলাম, আমার কথার কোন রদবদল নেই। এরপর আমি মূসা (আঃ)-এর নিকট ফিরে আসি। তিনি তখনো বললেন, আপনি ফিরে যান আল্লাহর দরবারে। আমি বললামঃ আমার লজ্জা লাগছে। তারপর জিবরীল (আঃ) আমাকে ‘সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা’ নিয়ে চললেন, আমরা পৌছলাম। তা এর বিচিত্র রঙে আবৃত যে, আমি বুঝতে পারছি না যে, আসলে তা কী? তারপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো। তথায় ছিল মুক্তার গম্বুজ আর তার মাটি ছিল মিশকের।[29]

আযাবঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন আমাকে মি’রাজে নিয়ে যাওয়া হল, সে সময় এমন ধরনের কিছু মানুষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখ ছিল তামার, তা দিয়ে তারা নিজেদের মুখমণ্ডল আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি, প্রশ্ন করলাম, ওরা কারা? হে জিবরীল! তিনি বললেন, ওরা সেই লোক, যারা মানুষের মাংস ভক্ষণ করত ও তাদের সম্ভ্রম লুটে বেড়াত।[30]

কোরআন ও হাদীসের আলোকে শবে মে’রাজের ঘটনা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি তাঁর বান্দাদের কখনো দুঃখকষ্ট দ্বারা পরীক্ষা করবেন না এই অবস্থা ছাড়া যে সেই দুঃখকষ্টের সাথে স্বস্তি থাকবে এবং পরেও স্বস্তি থাকবে। আল্লাহ তা’আলা আরো বলেছেন যারা ধৈর্যশীল তাঁরা তাঁদের ধৈর্যের ফল আস্বাদন করবে। অতঃএব যখন রাসূল সাঃ এর জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনাগুলো ঘটে তখন এটাই স্বাভাবিক যে রাসূল সাঃ কে সর্বকালের সেরা একটি উপহার দেয়া হবে। কিছু সংখ্যক আলেম বলেন এটা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনা যা মুহাম্মাদ সাঃ এর সাথে ব্যক্তিগতভাবে সংঘটিত হয়েছিল, আর তা হচ্ছে ইসরা এবং মে’রাজের ঘটনা।

---

[29] সহিহ মুসলিম (ই.ফা. ৩১২; ই.সে. ৩২৩)

[30] আহমাদ ৩/২২৪, সহীহ আবূ দাউদ ৪০৮২, সহীহ তারগীব ২৮৩৯

আল ইসরা মানে রাত্রিকালীন ভ্রমণ যা মুহাম্মাদ সাঃ মক্কা থেকে জেরুসালেম পর্যন্ত করেছিলেন। আল মে'রাজ অর্থ "উপরে আরোহণেরর মাধ্যম বা সিঁড়ি"। তবে আমরা মে'রাজ বলতে বুঝি মুহাম্মাদ সাঃ এর স্বশরীরে আকাশে আরোহণ।

হিজরতে মদীনার আগের কথা। বাধা আর সফলতার মাঝে এগিয়ে চলছিল ইসলামের অগ্রযাত্রা। কাফির-মুশরিকদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ আর অকথ্য নির্যাতনে শানিত হচ্ছিল মু'মিনের ঈমান, জ্বলে উঠছিল মুসলমানের দ্বীনী জযবা। এমনি সময়ে কোনো এক রাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে ইশার নামায আদায় করলেন। অতঃপর খানায়ে কাবা সংলগ্ন 'হাতীমে' শুয়ে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। এই সেই 'হাতীম', যা এক সময়ে খানায়ে কাবারই অংশ ছিল। মক্কার কাফেররা গুরুত্বপূর্ণ কাজে এখানে সমবেত হত, পরস্পর শপথ ও মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হত। সংকটাপন্ন মুহূর্তে দুআর জন্য প্রসারিত করত দু'হাত। মক্কার সর্দারেরা এখানে প্রায় বিশ্রাম নিত। নবীজীও মাঝে মাঝে আরাম করতেন। ওই রাতেও নবীজী সেখানে তন্দ্রাবিষ্ট ছিলেন; নিদ্রা তখনও আসেনি। আর নবী-রাসূলগণের নিদ্রা তো এমনই হয়; চোখ দুটো তাঁদের মুদে আসলেও ক্বলব থাকে সতত জাগ্রত। জিবরীল আমীন আঃ নেমে এলেন। নবীজীকে জাগ্রত করলেন। অতঃপর তাঁকে নিয়ে গেলেন আবে যমযমের নিকটে। তাঁর বক্ষের অগ্রভাগ হতে চুল পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হল। বের করা হল তাঁর হৃৎপিন্ড। তা আবে যমযম দ্বারা শোধন করা হল। ঈমান ও প্রজ্ঞায় ভরপুর স্বর্ণের একটি পেয়ালা এনে তা দিয়ে ভরে দেওয়া হল নবীজীর বক্ষ মুবারক। অতঃপর হৃৎপিন্ড যথাস্থানে রেখে দিয়ে উপরিভাগ সেলাই করে দেয়া হল। হযরত আনাস রা. বলেন, আমি এর চিহ্ন নবীজীর বুকে প্রত্যক্ষ করেছি।
'বুরাক' নামক ক্ষিপ্রগতির একটি সওয়ারী আনা হল, যা ছিল গাধার চেয়ে বড় ও খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং দীর্ঘদেহী। রং ছিল শুভ্র। এমনই ক্ষিপ্র ছিল তার চলার গতি যে, দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে গিয়ে পড়ত তার পায়ের খুর। তার পিঠের উপর জিন আঁটা ছিল, মুখে ছিল লাগাম। নবীজী রেকাবে পা রাখবেন এমন সময় 'বুরাক' ঔদ্ধত্য দেখাল। জিবরীল তাকে থামিয়ে বললেন, হে বুরাক! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছ? তুমি কি জান, আল্লাহর কাছে তার চেয়ে মহান ও প্রিয়তম কোনো ব্যক্তি কখনও তোমার উপর সওয়ার হয়নি। একথা শুনতেই বুরাক ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। অতঃপর নবীজী বুরাকে আরোহণ করলেন। মুহূর্তেই এসে উপস্থিত হলেন জেরুজালেম নগরীর বায়তুল মাকদিসে। জিবরীল একটি পাথর ছিদ্র করে বুরাককে বেঁধে রাখলেন। এটা সেই বৃত্ত, যেখানে নবীগণও নিজেদের বাহন বেঁধে রাখতেন। বায়তুল মাকদিসে ঢুকে তিনি দেখেন, হযরত মূসা আঃ নামাযরত আছেন। তিনি ছিলেন ছিপছিপে ও দীর্ঘ দেহের অধিকারী। তাঁর চুল ছিল কোঁকড়ানো, যা ছিল কান পর্যন্ত

ঝুলন্ত। দেখে মনে হবে যেন ‘ শানওয়া’ গোত্রেরই একজন লোক। হযরত ঈসা আঃ কেও দন্ডায়মান হয়ে নামায পড়তে দেখা গেল। তিনি ছিলেন মাঝারি গড়নের, সাদা ও লাল রং বিশিষ্ট। তাঁর চুল ছিল সোজা ও চাকচিক্যময়। তাঁর আকার-আকৃতি সাহাবী উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী রাঃ এর সাথে অধিক মেলে। হযরত ইব্রাহীম আঃ কেও নামাযরত অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হল। নবীজী বলেন, তাঁর দেহাবয়ব আমার সাথে অধিক সামঞ্জ্যশীল।

ইতিমধ্যে জামাত প্রস্তুত হল। তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। সকল নবী-রাসূলগণ নবীজীর পিছনে ইক্তেদা করলেন। ওখান থেকে বের হয়েই দেখলেন, জিবরীল আঃ এর হাতে দুটি সুদৃশ্য পাত্র। একটি শরাবের, অপরটি দুধের । পাত্রদুটি পেশ করা হলে নবীজী দুধেরটিকেই বেছে নিলেন। এতদ্দর্শনে জিবরীল আঃ তাঁকে বললেন, আপনি ও আপনার উম্মত স্বভাবজাত ফিত্রাতকেই বেছে নিয়েছেন। আপনি যদি শরাব পছন্দ করতেন, তাহলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।

এরপর শুরু হল ঊর্ধ্বজগতের সফর। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুরাকের উপরই ছিলেন। একে একে প্রতি আকাশের দ্বার তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। প্রথমে দুনিয়ার দৃশ্যমান আসমানে এসে জিবরীল আঃ দ্বার উন্মুক্ত করতে অনুরোধ করেন। অপর প্রান্ত হতে প্রশ্ন হয়, কে আপনি? তিনি বললেন, আমি জিবরীল। প্রশ্ন করা হয়, কে আছেন আপনার সাথে? বললেন, মুহাম্মাদ। প্রশ্ন হয়, আপনি কি তাঁর কাছে প্রেরিত হয়েছেন? বললেন, হাঁ। অতঃপর প্রথম আসমানের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। তাঁরা এর উপরে উঠে আসেন। নবীজী বলেন, ওখানে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার ডানদিকে রূহের একটি ঝাঁক দেখা গেল, বামদিকেও তেমনি একটি ঝাঁক। ওই ব্যক্তি ডানদিকে তাকালে হাসেন আর বামদিকে তাকালে ক্রন্দন করেন। তিনি আমাকে দেখে অভ্যর্থনা জানালেন এবং বললেন, মারহাবা হে মহান পুত্র! মারহাবা হে মহান নবী!! নবীজী জিবরীলকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? তিনি বললেন, তিনি আদম আঃ। তাঁর ডান ও বামদিকে যাদের দেখলেন তারা তাঁর আওলাদ। ডানদিকে যারা তারা জান্নাতী; আর বামদিকে যারা, তারা দোযখী। আর তাই তিনি ডানদিকে তাকিয়ে হাসেন এবং বামদিকে তাকিয়ে কাঁদেন।

এরপর জিবরীল আঃ নবীজীকে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশের পানে ছুটলেন। সেখানেও দ্বার উন্মুক্ত করতে বলা হলে জিজ্ঞাসা করা হল, কে? তিনি জবাব দিলেন, জিবরীল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি উত্তর দিলেন, মুহাম্মাদ। আবার প্রশ্ন হল, তিনি কি আহূত হয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ, তাঁকে আনার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। দ্বার উন্মুক্ত করা হলে সেখানে দু'খালাত ভাই অর্থাৎ হযরত ঈসা আঃ ও ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আঃ এর সাথে সাক্ষাৎ হল। তাঁরা উভয়ই নবীজীকে মারহাবা বলে দুআ করলেন। এরপর জিবরীল তাঁকে তৃতীয় আকাশে নিয়ে

গিয়ে পূর্বের মতো প্রশ্নোত্তর পর্বের পর দ্বার উন্মুক্ত হলে সেখানে হযরত ইউসুফ আঃ এর সাথে মুলাকাত হল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে গোটা রূপ-সৌন্দর্যের অর্ধেকটাই দান করেছিলেন। তিনিও নবীজীকে মারহাবা বলে উষ্ণ অভিবাদন জ্ঞাপন করলেন।

একই পদ্ধতিতে চতুর্থ আকাশে পৌঁছালে সেখানে হযরত ইদরীস আঃ এর সাথেও শুভেচ্ছা বিনিময় হল। নবীজী বলেন, আমরা যখন সেখান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলাম, তখন হযরত মূসা আঃ ক্রন্দন করতে লাগলেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এই যুবক আমার পরে প্রেরিত হয়েছে। তদুপরি তাঁর উম্মত আমার উম্মতের চেয়েও অনেক বেশি জান্নাতে যাবে। একথা ভেবেই আমি কাঁদছি। সেখান থেকে নবীজীকে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তিনি হযরত ইব্রাহীম আঃ কে দেখলেন, তিনি বায়তুল মা'মুরে ঠেস দিয়ে উপবিষ্ট। বায়তুল মা'মুর সেই স্থান যেখানে প্রত্যহ এমন সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদত করার জন্য প্রবেশ করে, যাদের পালা এরপর আর কখনও আসে না।

হযরত ইব্রাহীম আঃ ও নবীজীকে দেখে অভ্যর্থনা জানালেন। অতঃপর তিনি নবীজীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মুহাম্মাদ! আপনার উম্মতকে আমার সালাম বলুন এবং তাদেরকে অবগত করুন যে, জান্নাতের মাটি পবিত্র, এর পানি সুমিষ্ট। জান্নাত হচ্ছে খুব পরিচ্ছন্ন ও সমতল। এর বৃক্ষ হচ্ছে-

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

অতঃপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল। পৃথিবী থেকে যেসকল বস্তু অথবা রূহ উপরে আরোহণ করে, সেগুলো এখানে পৌঁছে থেমে যায়। তদ্রূপ ঊর্ধ্বজগৎ থেকে নিম্নে আগমনকারী সব কিছু এখানে এসে থেমে যায়। নবীজী বলেন, সিদরাতুল মুনতাহার পাতা ছিল হাতির কানের মতো, আর ফল ছিল বড় মটকার মতো। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ যখন বৃক্ষটিকে ঘিরে নিল, তখন সে এক অপরূপ সাজে সজ্জিত হল। কোনো মানুষের সাধ্য নেই সে সৌন্দর্য বর্ণনা করার। নবীজী বলেন, সিদরাতুল মুনতাহা পেরিয়ে এত ঊর্ধ্বে পৌঁছে যাই, যেখান থেকে আমি আল্লাহর হুকুম-আহকাম লিপিবদ্ধ করার কাজে ব্যস্ত ফেরেশতাদের 'কলমের' আওয়াজ শুনতে পেলাম।

অতঃপর, আল্লাহ নবীজীকে যা দিবার ছিল তা দিলেন। তিনি দিনরাত্রিতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করলেন। ফিরে আসতে হযরত মূসা আঃ এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি নবীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার রব আপনার উম্মতের উপর কী ফরয করেছেন? নবীজী বললেন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। তিনি বললেন, আপনি মহান রবের কাছে ফিরে যান এবং আরও হ্রাস করার আবেদন করুন। এতটুকু পালনের সাধ্য আপনার উম্মতের নেই। আমি তো বনী ইসরাঈলকে এর চেয়ে অনেক কম ফরয দিয়ে খুব পরীক্ষা করে দেখেছি। নবীজী ফের মহান রবের কাছে ফিরে

গেলেন এবং বললেন, রাব্বুল আলামীন! আমার উম্মতের জন্য নামায আরও হ্রাস করুন। আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। ফিরে আসার সময় পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত নামাযের কথা হযরত মূসা আঃ কে জানালে তিনি বললেন, আপনার উম্মতের এতটুকু পালন করার সামর্থ্য নেই। অতএব আরও হ্রাস করার আবেদন করুন। নবীজী বললেন, আমি এমনিভাবে বারবার আপন রব ও মূসা আঃ এর কাছে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম। আর প্রতিবারই পাঁচ-পাঁচ করে কমতে থাকল। অবশেষে আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, মুহাম্মাদ! দিবা-রাত্রির মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই মাত্র। প্রত্যেক নামাযের জন্য দশ নামাযের সওয়াব, ফলে সেই পঞ্চাশ নামাযই হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সৎকাজের ইচ্ছা করবে, এরপর তা আমলে পরিণত করবে না, তার জন্যও একটি নেকী লেখা হবে। আর যে ইচ্ছা করার পর আমলেও পরিণত করবে, সে দশটি নেকী পাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মন্দ কর্মের কেবল ইচ্ছা করে, আমলে পরিণত করে না, তার কোনো গুনাহ লেখা হবে না। আর যদি আমলেও পরিণত করে তবে একটি মাত্র গুনাহ লিপিবদ্ধ হবে।

নবীজী বলেন, এরপর আমি নেমে এসে হযরত মূসা আঃ এর কাছে গেলাম। তাঁকে সবকিছু অবগত করলে তিনি বললেন, আপনার রবের কাছে গিয়ে আরও হ্রাস করার আবেদন করুন। আমি বললাম, মহান প্রভুর কাছে অনেকবার গিয়েছি, আবেদন করেছি। এখন আমার লজ্জা হচ্ছে। অবশেষে জান্নাত, জাহান্নাম ও সপ্তাকাশের দীর্ঘ সফর করে মহান মাওলার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়ে নবীজী ফিরে এলেন মক্কায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পবিত্র রজনীতে মুসলমানদের জন্য তিনটি বিষয় হাদিয়াস্বরূপ নিয়ে এসেছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ এবং পুরো উম্মতের মধ্যে শিরক থেকে আত্নরক্ষাকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত ও ক্ষমার ঘোষণা। এ ছিল উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য মে'রাজের পুরস্কার।

এ ছিল মে'রাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র। এর মাঝে জান্নাত ও জাহান্নামসহ বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করেছেন নবীজী। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পৃথক অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল মাকদিসে যাওয়া বা আসার পথে মক্কার কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলাও দেখতে পেয়েছিলেন।

শবে মে'রাজের সকাল বেলা। নবীজী হাতীমে কাবায় চিন্তিত মন নিয়ে একান্তে বসে আছেন। মনে মনে ভাবছেন, রাত্রে সংঘটিত মে'রাজ ও ইসরার কথা প্রকাশ করলে মানুষ আমাকে মিথ্যুক ঠাওরাবে না তো? ইতিমধ্যে কাছ দিয়ে যাচ্ছিল আবু জাহল। নবীজীর কাছে বসে বিদ্রুপের ছলে বলল, কোনো ব্যাপার আছে নাকি? নবীজী বললেন, হাঁ। সে বলল কী? তিনি জবাব দিলেন, আজ রাতে আমার মে'রাজ হয়েছে। সে বিস্ময়ের সাথে সুধাল, কতদূর পর্যন্ত যাওয়া হয়েছিল? নবীজী বললেন, বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত। সে আরও ঠাট্টা করে বলে উঠল,

চমৎকার তো! এরপর সকালেই তুমি আমাদের কাছে এসে গেলে? তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, হাঁ। এরপর আবু জাহল কথা না বাড়িয়ে তাঁকে বলল, আচ্ছা! আমি যদি পুরো কওমকে ডেকে নিয়ে আসি তাহলেও কি তুমি একই কথা বলতে পারবে? নবীজী আরও সুদৃঢ় হয়ে বললেন, অবশ্যই। আবু জাহল লুয়াই ইবনে কা'ব গোত্রের নাম ধরে ডাকতে লাগল। আর তারাও দলে দলে খানায়ে কাবায় সমবেত হতে লাগল। সকলে এসে উপস্থিত হলে আবু জাহল বলল, আমাকে যা কিছু তুমি শুনিয়েছিলে, পারলে তা এদের কাছেও ব্যক্ত করো। নবীজী পুনরায় একই ঘটনা তাদের সম্মুখে ব্যক্ত করলে কিছু লোক বিস্ময়ে হাতের উপর হাত রাখল। আবার অনেকেই হতবাক হয়ে মাথায় হাত দিল। তারা বলল, তাহলে তুমি কি আমাদের কাছে বায়তুল মাকদিসের অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে? উল্লেখ্য, উপস্থিত অনেকেই বায়তুল মাকদিস সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিল।

নবীজী বলেন, আমি তাদের কাছে বায়তুল মাকদিসের অবস্থা বর্ণনা করতে লাগলাম। কিছু বিষয় আমার কাছে অস্পষ্ট মনে হচ্ছিল। মনে মনে আমি খুব চিন্তিত হচ্ছিলাম। আমি তখনও কাবার হাতীমে পুরো কওমের সামনে দন্ডায়মান, ইতিমধ্যেই পুরো বায়তুল মাকদিস আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত করা হল। আকীলের ঘরের উপর উদ্ভাসিত বায়তুল মাকদিস আমি স্বচক্ষে দেখে দেখে সব কিছু নিসংকোচে বলতে লাগলাম। শুনে উপস্থিত লোকেরা মন্তব্য করল, মানচিত্র ও অবস্থা তো সঠিকই বর্ণিত হয়েছে।

মক্কার কোনো পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন হযরত আবু বকর রাঃ। মক্কার কাফেররা তাকে এ বিস্ময়ের কথা বলে সুধাল, তবুও কি তুমি তাকে বিশ্বাস করবে? হযরত আবু বকরের হৃদয়ে ঈমানের বহ্নিশিখা জ্বলে উঠল। তিনি এক আকাশ আস্থা নিয়ে সুদৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি তো এর চেয়েও আরো দূরের অনেক জটিল বিষয়েও তাঁকে বিশ্বাস করি। তাঁর কাছে আসা আসমানী বার্তাসমূহের উপর রয়েছে আমার অটল বিশ্বাস ও সুদৃঢ় ঈমান। সেদিন থেকেই আবু বকরের উপাধি হয়ে যায় 'সিদ্দিক' অর্থাৎ অতীব সত্যতার অধিকারী।

আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনটি হাদিয়াঃ

মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে আল্লাহ এসময় রাসূলকে সাঃ তিনটি বিষয় হাদিয়া হিসেবে প্রদান করেন।

১। পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত

২। সূরা বাক্বারার শেষ আয়াতগুলো অর্থাৎ শেষ আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু।

৩। রাসূলের উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করবে না আল্লাহ তার কবীরা গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। অর্থাৎ কবীরা গুনাহগার জাহান্নামী হবে তবে কাফির-মুসরিকদের মতো চরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না বরং কবীরা গুনাহের অনেকেই নবীদের সুপারিশে, কেউ আল্লাহর প্রিয় ফেরেশতাদের সুপারিশে কেউবা নিছক আল্লাহর মেহেরবানিতে ক্ষমা লাভ করবে।

তথ্যসূত্রঃ https://www.alkawsar.com/bn/article/2542/

মে'রাজের নিদর্শন

মে'রাজের রাতে জান্নাত ও জাহান্নামসহ বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করেছেন রসূলুল্লাহ সাঃ। বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত বর্ণনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য বিচিত্র ঘটনাবলি থেকে নির্ভরযোগ্য কিছু ঘটনার উল্লেখ এখানে করা হলো।

নবী আঃ দের সাথে সাক্ষাৎঃ মে'রাজের রাত্রে একেক আসমানে মুহাম্মাদ সাঃ এর সাথে একেকজন নবীর (আঃ) এর সাক্ষাৎ হয়। জিবরিল আঃ তাঁদের সাথে মুহাম্মাদ সাঃ কে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁরা সালাম এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। হাদিসে তাঁদের দৈহিক গঠনের বর্ণনাও এসেছে।
প্রথম আসমানে হযরত আদম আঃ এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। দ্বিতীয় আকাশে হযরত ইয়াহইয়া(আঃ) এবং ঈসা (আঃ), তৃতীয় আকাশে হযরত ইউসুফ আঃ, চতুর্থ আকাশে হযরত ইদ্রিস(আঃ), পঞ্চমআকাশে হারুন আঃ, ষষ্ঠ আকাশে ছিলেন হযরত মুসা আঃ এবং সপ্তম আকাশে ইবরাহীম আঃ।

বায়তুল মা'মুরঃ রসূল সাঃ বলেনঃ অতঃপর আমার সামনে বায়তুল মা'মূর উম্মুক্ত করা হলো। বায়তুল মামূর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জিবরীল আঃ বললেন- এটি হলো বায়তুল মা'মূর। এতে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা সলাত আদায় করে। এক বার যে সেখান থেকে বের হয়ে আসে কিয়ামতের পূর্বে সে আর তাতে প্রবেশের সুযোগ পাবেনা। সেখানে তিনি দেখলেন ইবরাহীম আঃ বায়তুল মা'মুরে হেলান দিয়ে আছেন।

সিদরাতুল মুনতাহাঃ সিদরাতুল মুনতাহা হলো সীমান্তের কূলবৃক্ষ। এটি আল্লাহ তা’আলার অন্যতম বড় একটি নিদর্শন। এটিকে আল্লাহ তা‘আলা উর্ধ্বজগতে সৃষ্টি করেছেন। এর সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এর ফলগুলো হিজর গোত্রের কলসীর মত, পাতাগুলো হাতির কানের মত বৃহৎ, সোনালী রঙ্গের প্রজাপতি সদৃশ সুন্দর সৃষ্টিরা সেখানে বসছে ও উড়ছে। ফেরেশতাগণ চারদিক থেকে ওটাকে বেষ্টন করে ছিলেন। এর প্রকৃত সৌন্দর্য মনোরম পরিবেশ কোনো সৃষ্টির পক্ষেই বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সৃষ্টির জ্ঞান সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। এর পরের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটেই। যে জিনিস উপরে উঠে তা এখান পর্যন্ত পৌঁছে, তারপর এখান থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়। আর যে জিনিস অবতরণ করে তা এখান পর্যন্ত অবতারিত হয় এবং তারপর এখান থেকে গ্রহণ করা হয়। নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মে'রাজের রাতে এ পর্যন্তই গিয়েছিলেন এবং সেখানকার সৌন্দর্যের কিছু দিক হাদীছে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যেন আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস এবং সেখানকার সৌন্দর্য উপভোগ করার তাওফীক দেন।

নহরঃ মুহাম্মাদ সাঃ সিদরাতুল মুনতাহা গাছের গোড়াতে চারটি নদী দেখতে পেলেন। দু'টি চলে গেছে ভিতরের দিকে এবং দুটি চলে গেছে বাহিরের দিকে। ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে- দুটি নদী প্রকাশ্য এবং দুটি নদী গোপন। জিবরীলকে আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন- ভিতরের দিকে প্রবাহিত নদী দুটি জান্নাতে চলে গেছে এবং বাহিরের নদী দুটি হলো ফোরাত ও নীল। ফোরাত ও নীল দেখার অর্থ হল নাবী সাঃ এর মিশন অচিরেই ঐ নদী দুটির অঞ্চলে পৌঁছে যাবে এবং ঐ সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা যুগে যুগে ইসলামের পতাকা বহন করবে। এর অর্থ এই নয় যে এ দু'টি নদী জান্নাত থেকে বের হয়ে এসেছে। জান্নাতের নদী দুটি হচ্ছে কাউসার(১০৮ঃ১) এবং সালসাবিল।(৭৬ঃ১৮)

জিবরিল আঃ কে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দর্শনঃ মে'রাজের রাত্রিতে মুহাম্মাদ সিদরাতুল মুনতাহায় জিবরীল ফেরেশতাকে আসল আকৃতিতে দেখলেন। অথচ ইতিপূর্বে তিনি আরেকবার দুনিয়াতে তাঁকে দেখেছিলেন। যাঁর ছ'শটি পালক ছিল।

তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছেনঃ মে'রাজের রাতে রাসূল সাঃ জান্নাত এবং জাহান্নামের বহু নিদর্শন দেখেছেন। মে'রাজের রাতে রাসূল সাঃ জান্নাত, জাহান্নামের যা কিছু দেখেছেন তা ভিন্ন অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

জাহান্নামের ফেরেশতা মা'লিকের সাথে সাক্ষাতঃ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাঃ বলেন, "আমি মে'রাজের রাত্রিতে মুসা আঃ, দাজ্জাল ও জাহান্নামের পরিচালক মালিক ফেরেশতাকে দেখেছি।" তবে রাসূল সা মালিক ফেরেশতাকে মাসজিদুল আক্বসায় দেখেছেন নাকি আসমানে দেখেছেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। জিবরীল রাসূল সাঃ কে বললেন, "হে মুহাম্মাদ! ইনি হলেন মালিক, জাহান্নামের প্রহরী। তাঁকে সালাম দিন"। রাসূল সাঃ মালিককে সালাম দেওয়ার জন্য তাঁর দিকে ঘুরতেই মালিক আগে রাসূল সাঃ কে সালাম দিলেন। রাসূল সাঃ দেখলেন, মালিকের চেহারা খুব বিষণ্ন। তিনি জিবরীল আঃ কে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে জিবরীল বললেন, "তাঁর সৃষ্টির পর থেকে সে কখনও হাসেনি। যদি সে কারও জন্য হাসত, তবে আপনার জন্যই হাসত।" মূলত জাহান্নামের প্রহরী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে জাহান্নামের ভয়াবহতা তাক হাসতে ভুলিয়ে দিয়েছিল।[31]

হাউজে কাউসারঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ "আমি একটি নদী দেখলাম। যাতে মণিমুক্তা, ইয়াকূত ও যবরজদের পানপাত্র ছিল। জিবরিল আঃ বললেনঃ "এটা কোন নহর তা জানেন কি?" আমি জবাব দিলামঃ "না"। তিনি তখন বললেনঃ "এটা হচ্ছে নহরে কাওসার। এটা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করার জন্য রেখেছেন।" তাতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পানপাত্র ছিল যাতে ইয়াকূত ও মণিমাণিক্য জড়ানো ছিল। ওর পানি ছিল দুধের চেয়েও বেশী সাদা। আমি একটি সোনার পেয়ালা নিয়ে তা এ পানি দ্বারা পূর্ণ করে পান করলাম। এ পানি ছিল মধুর চেয়েও বেশী মিষ্ট এবং মিশক আম্বারের চেয়েও বেশী সুগন্ধময়।

বোরাকঃ বোরাকের বর্ণনা হাদীছে এভাবে এসেছে যে, এটি ছিল চকচকে উজ্জ্বল, গাধার চেয়ে একটু বড় এবং খচ্চরের চেয়ে একটু ছোট। সেটি এত দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিল যে, তার চোখের দৃষ্টি যে পর্যন্ত পৌঁছতো, সেখানে সে এককেবার পা ফেলতো।

ওর কান দুটি ছিল উপরের দিকে উত্থিত ও দোদুল্যমান। বুরাক যখন উপরের দিকে উঠতো তখন তার হাত-পা সমান হয়ে যেতো। অনুরূপভাবে যখন নীচের দিকে নামতো তখনও সমানই থাকতো, যাতে আরোহীর কোন কষ্ট না হয়। মুসনাদে আহমদে রয়েছে যে, বুরাকের লাগামও ছিল এবং জিন বা গদীও ছিল। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সওয়ার হওয়ার সময় যখন সে ছটফট করতে থাকে তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাকে বলেনঃ "তুমি এটা কি করছো? আল্লাহর কসম!

---

31 (বুখারী, কিতাবু আহাদীছুল আম্বীয়া, হা/৩১৮২, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, হা/২৫১)

তোমার উপর ইতিপূর্বে এঁর চেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কখনো সওয়ার হয় নাই।" একথা শুনে বুরাক সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়ে যায়।

ফেরাউনের কণ্যার দাসীর ঘটনাঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মি'রাজের রাত্রে এক স্থান হতে আমার কাছে এক অতি উচ্চমানের খুশবু'র সুগন্ধ আসছিল। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ এই খুশবূ কিরূপ? হযরত জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে বললেনঃ "ফিরাউনের কন্যার পরিচারিকা এবং তার সন্তানদের প্রাসাদ হতে এই সুগন্ধ আসছে। একদা এই পরিচারিকা ফিরাউনের কন্যার চুল আচঁড়াচ্ছিল। ঘটনাক্রমে তার হাত হতে চিরুণী পড়ে যায়। অকস্মাৎ তার মুখ দিয়ে বিসমিল্লাহ বেরিয়ে যায়। তখন শাহ্জাদী তাকে বলেঃ "আল্লাহ তো আমার আব্বা"। পরিচারিকাটি তার একথায় বললোঃ "না, বরং আল্লাহ তিনিই যিনি আমাকে, তোমাকে এবং স্বয়ং ফিরাউনকে জীবিকা দান করে থাকেন।" শাহজাদী বললোঃ "তাহলে তুমি কি আমার পিতাকে ছাড়া অন্য কাউকেও তোমার প্রতিপালক স্বীকার করে থাকো?" জবাবে সে বললোঃ "হা, আমার, তোমার এবং তোমার পিতার, সবারই প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলাই।" শাহজাদী এ সংবাদ তার পিতা ফিরআউনের কাছে পৌঁছিয়ে দিলো। এতে ফিরাউন ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ তার দরবারে তাকে ডেকে পাঠালো। সে তার কাছে হাজির হলো। তাকে সে জিজ্ঞেস করলোঃ "তুমি কি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও তোমার প্রতিপালক স্বীকার করে থাকো?" উত্তরে সে বললোঃ "হা, আমার এবং আপনার প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলাই বটে।" তৎক্ষণাৎ ফিরাউন নির্দেশ দিলোঃ "তামার যে পাত্রটি নির্মিত আছে ওকে খুবই গরম কর। যখন ওটা সম্পূর্ণরূপে আগুনের মত হয়ে যাবে তখন তার ছেল মেয়েগুলিকে এক এক করে ওর উপর নিক্ষেপ কর। পরিশেষে তাকে নিজেকেও তাতে নিক্ষেপ করবে।" তার এই নিদের্শ অনুযায়ী ওটাকে গরম করা হলো এবং যখন আগুনের মত হয়ে গেল তখন তার সন্তানদেরকে একের পর এক তাতে নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। পরিচারিকাটি বাদশাহর কাছে একটি আবেদন জানিয়ে বললোঃ "আমার এবং আমার এই সন্তানদের অস্থিগুলি একই জায়গায় নিক্ষেপ করবেন।" বাদশাহ তাকে বললোঃ "ঠিক আছে, তোমার এই আবেদন মঞ্জর করা হলো। কারণ, আমার দায়িত্বে তোমার অনেকগুলি হক বা প্রাপ্য বাকী রয়ে গেছে।" যখন তার সমস্ত সন্তানকে তাতে নিক্ষেপ করা হয়ে গেল এবং সবাই ভষ্মে পরিণত হলো তখন তার সর্বকনিষ্ঠ শিশুটির পালা আসলো। এই শিশুটি তার মায়ের স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধপান করছিল। ফিরাউনের সিপাহীরা শিশুটিকে যখন তার মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিলো তখন এ সতী সাধ্বী মহিলাটির চোখের সামনে শিশুটির মুখ ফুটে গেল এবং উচ্চ স্বরে বললোঃ আম্মাজান! দুঃখ করবেন না। মোটেই আফসোস করবেন না। সত্যের উপর জীবন উৎসর্গ করাই তো হচ্ছে সবচেয়ে বড় পুণ্যের কাজ।" শিশুর এ কথা শুনে

মায়ের মনে সবর এসে গেল। অতঃপর এ শিশুটিকে তাতে নিক্ষেপ করে দিলো এবং সর্বশেষে মাতাকেও তাতে ফেলে দিলো। এই সুগন্ধ তাদের বেহেশতী প্রাসাদ হতেই আসছে (আল্লাহ তাদের সবারই প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই ঘটনাটি বর্ণনা করার পরেই একথাও বর্ণনা করেন যে, চারটি শিশু দোলনাতেই কথা বলছিল। একটি হচ্ছে এই শিশুটি। দ্বিতীয় হচ্ছে এ শিশুটি যে হযরত ইউসুফের (আঃ) পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেছিল। তৃতীয় হলো এ শিশুটি যে আল্লাহর ওয়ালী হযরত জুবায়েজের (রাঃ) পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়েছিল। আর চতুর্থ হলেন হযরত ঈসা ইবনু মরিয়ম (আঃ)।

তাক্বদীর লিপিবদ্ধকারী কলমের লেখার খসখস শব্দ শ্রবণঃ শেষ পর্যন্ত তিনি কলমের খসখস (শরিফুল আক্বলাম) শুনতে পান। কলম তখন লাওহে মাহজুযে তাক্বদীর এবং আল্লাহর ফায়সালা লেখায় ব্যস্ত ছিল। সেই সাথে ফেরেশতাবর্গ আল্লাহর বিভিন্ন নির্দেশ এবং হুকুম আহকাম মাহফুয থেকে নকল করছিল। রসূলুল্লাহ সাঃ এরই শব্দ শুনতে পান।

জান্নাতের বর্ণনা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাত দেখার সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন।[32] তিনি জান্নাতে যা যা দেখেছিলেন সহিহ হাদিসের আলোকে তার কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হলো।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি উপত্যকায় পৌঁছেন। সেখানে অত্যন্ত সুন্দর মন মাতানো ঠাণ্ডা বাতাস এবং মনোমুগ্ধকর সুগন্ধ ও আরাম ও শান্তির বরকতময় শব্দ শুনে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "এটা কি?" উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ "এটা হচ্ছে জান্নাতের শব্দ। সে বলছেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমার সাথে আপনি যে ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ করুন! আমার অট্টালিকা, রেশম, মনিমুক্তা, সোনারুপা, জাম-বাটী, মধু, দুধ, মদ ইত্যাদি নিয়ামতরাজি খুব বেশী হয়ে গেছে।" তাকে তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে জবাব দেয়া হয়ঃ "প্রত্যেক মুসলমান-মুমিন নর ও নারী যে আমাকে ও আমার রাসূলদেরকে মেনে চলে, ভাল কাজ করে, আমার সাথে কাউকেও শরীক করে না, আমার সমকক্ষ কাউকেও মনে করে না, তারা সবাই তোমার মধ্যে প্রবেশ করবে। জেনে রেখো, যার অন্তরে আমার ভয় আছে সে সমস্ত ভয় থেকে রক্ষিত থাকবে। যে আমার কাছে চায় সে বঞ্চিত হয় না। যে আমাকে কর্জ দেয় অর্থাৎ কর্জে হাসানা দেয় তাকে আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি। যে আমার উপর ভরসা করে আমি তার জন্যে যথেষ্ট হই। আমি সত্য মা'বুদ। আমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। আমি ওয়াদার খেলাফ করি না। মুমিন মুক্তিপ্রাপ্ত।

[32] তিরমিযী, হাদীস ৩১৪৭

আল্লাহ তাআলা কল্যাণময়। তিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা" একথা শুনে জান্নাত বললোঃ "যথেষ্ট হয়েছে। আমি খুশী হয়ে গেলাম।"[33]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দেখতে পেলেন যে, এক কওম একদিকে ফসল কাটছে, অন্যদিকে ফসল গজিয়ে যাচ্ছে। হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "এ লোকগুলি কারা?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "এরা হচ্ছে আল্লাহর পথের মুজাহিদ যাদের পুণ্য সাতশ'গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তারা যা খরচ করে তার প্রতিদান তারা পেয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা উত্তম রিযক দাতা ।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ) সপ্তম আকাশে এমন একটি লোককে দেখতে পান যার দাড়ীর কিছু অংশ সাদা হয়ে গিয়েছিল। তিনি জান্নাতের দরজার উপর একটি চেয়ার লাগিয়ে বসে ছিলেন। তার পার্শ্বে আরো কিছু লোকও ছিলেন। কতকগুলি চেহারা ঔজ্জ্বল ঝকঝকে, কিন্তু কতকগুলি চেহারায় ঔজ্জ্বল্য কিছু কম ছিল এবং রঙ এ কিছুটা ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এই লোকগুলি উঠে গিয়ে নদীতে ডুব দিলো। ফলে রঙ কিছুটা পরিষ্কার হলো। তারপর আর এক নহরে তারা ডুব দিলো। এবার রঙ আরো কিছুটা পরিচ্ছন্ন হলো। এরপর তারা তৃতীয় একটি নহরে গোসল করলো। এবার তাদের উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোকদের সাথে মিলিত ভাবে বসে পড়লো। এখন তারা তাদের মতই হয়ে গেল। হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এঁদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "বৃদ্ধ লোকটি হলেন আপনার পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)। সারা দুনিয়ায় সাদা চুল সর্বপ্রথম তারই দেখা যায়। ঐ উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোক হচ্ছে ঐ সব ঈমানদার লোক যারা মন্দ কাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থেকেছে। আর যাদের চেহারায় কিছুটা কালিমা ছিল তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা ভাল কাজের সাথে কিছু খারাপ কাজও করেছিল তারা তাওবা করায় মহান আল্লাহ তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। প্রথমে তারা গোসল করেছে নহরে রহমতে, দ্বিতীয় বার নহরে নিয়ামতিল্লা হতে এবং তৃতীয়বার নহরে শরাবে তহুরে। এই শরাব হচ্ছে জান্নাতীদের বিশিষ্ট শরাব বা মদ।"

মুসনাদে আহমাদে ইবনে আব্বাস থেকে বিশুদ্ধ সনদের হাদিসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মি'রাজের রাত্রে যখন জান্নাতে তশরীফ আনেনে তখন একদিক হতে পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "হে জিবরাঈল (আঃ)! এ ব্যক্তি কে?" উত্তরে হযরত জিবরাঈল

---

[33] তাফসীর ইবনে কাসির

(আঃ) বলেনঃ “ইনি হচ্ছেন মুআযযিন হযরত বিলাল (রাঃ)।” রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মি'রাজ হতে ফিরে এসে বলেনঃ “হে বিলাল (রাঃ)! তুমি মুক্তি পেয়ে গেছ। আমি এরূপ এরূপ দেখেছি।”
রাসূল সাঃ জান্নাতে প্রবেশ করে কালো রক্তিম অধর বিশিষ্ট এক রুপশীকে দেখতে পেলেন। তিনি মুগ্ধ হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কার? উত্তরে সে বললোঃ “আমি হলাম হযরত যায়েদ ইবন হারেসার (রাঃ)।

এছাড়াও রাসূল সাঃ জান্নাতে অসম্ভব সুন্দর স্বচ্ছ কাঁচের একটি প্রাসাদ দেখেছিলেন। তিনি জিবরীল আঃ কে জিজ্ঞেস করলেন সেটি কার? জিবরীল বললেন, “এটি উমার ইবনুল খাত্তাব এর প্রাসাদ”।

রাসূল সাঃ মে'রাজের রাত্রিতে জান্নাতে যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েলের পুরষ্কারস্বরুপ দুটি প্রাসাদ দেখেছেন। তিনি মে'রাজ থেকে ফিরে আসার পর সাইদ ইবনে যায়েদ রাঃ কে বলেছিলেন- “আমি তোমার পিতাকে জান্নাতে দেখেছি। আল্লাহ তাকে দুটি জান্নাত দান করেছেন।”

জাহান্নামের বর্ণনা

এক বর্ণনায় রাসূল সাঃ বলেনঃ অতঃপর আমার সামনে জাহান্নাম পেশ করা হলো, যেখানে ছিল আল্লাহ তাআলার ক্রোধ, তাঁর শাস্তি এবং তাঁর অসন্তুষ্টি। যদি তাতে পাথর ও লোহ নিক্ষেপ করা হয় তবে ওগুলিকেও খেয়ে ফেলবে। এরপর আমার সামনে থেকে ওটা বন্ধ করে দেয়া হলো। এরপর আমি অন্য একটি উপত্যকায় গেলাম। যেখান থেকে বড় ভয়ানক ও জঘন্য শব্দ আসছিল। আর ছিল খুবই দুর্গন্ধ। আমি এসম্পর্কে হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "এটা হচ্ছে জাহান্নামের শব্দ। সে বলছেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ করুন! আমাকে তা দিয়ে দিন! আমার শৃংখল, আমার অগ্নিশিখা, আমার প্রখরতা, আমার রক্ত-পুঁজ এবং আমার শাস্তির আসবাবপত্র খুবই বেশী হয়ে গেছে, আমার গভীরতাও অত্যন্ত বেড়ে গেছে এবং আমার অগ্নি ভীষণ তেজ হয়ে উঠেছে। সুতরাং আমার মধ্যে যা দেয়ার আপনি ওয়াদা করেছেন তা দিয়ে দিন"। আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে বলেনঃ "প্রত্যেক মুশরিক, কাফির, খবীস, বেঈমান পুরুষ ও নারী তোমার জন্যে রয়েছে।" একথা শুনে জাহান্নাম সন্তোষ প্রকাশ করলো।"

রাসূল সাঃ মে'রাজের রাতে জাহান্নামে যে শাস্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার কিছু এখানে উল্লেখ করা হলো।

১। গীবতকারীর শাস্তিঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ "যখন আমাকে আমার মহামহিমান্বিত প্রতিপালকের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আমার গমন এমন কতকগুলি লোকের পার্শ্ব দিয়ে হয় যাদের তামার নখ ছিল, যার দ্বারা তারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষ আচঁড়াচ্ছিল।" আমি হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলামঃ "এরা কারা?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "এরা

হচ্ছে ওরাই যারা লোকের গোশত ভক্ষণ করতো (অর্থাৎ গীবত করতো) এবং তাদের মর্যাদার হানি করতো।”[34]

২। অপরের দোষ অন্বেষণ করা ব্যক্তিদের শাস্তিঃ আরো কিছু দূর গিয়ে দেখি যে, কতকগুলি লোকের পার্শ্বদেশের গোশত কেটে কেটে ফেরেশতাগণ তাদেরকে খাওয়াচ্ছেন। আর তাদেরকে তারা বলতে আছেন, “যেমন তোমরা তোমাদের জীবদ্দশায় তোমাদের ভাইদের গোশত খেতে তেমনই এখনো খেতে থাকো।” আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে জিবরাঈল (আঃ)! এরা কারা? উত্তরে তিনি বললেনঃ “এরা হচ্ছে আপনার উম্মতের ঐ সব লোক যারা অপরের দোষ অন্বেষণ করে বেড়াতো।”

সেখানেই তিনি একটি লোককে দেখতে পেলেন যে, স্বয়ং আগুনের মত লাল ছিল এবং চোখ ছিল বাকা ও টেরা। তিনি প্রশ্ন করলেনঃ “এটা কে?"উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ “এটাই হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে হযরত সালেহের (আঃ) উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল।

৩. বে-স্বলাতীর শাস্তিঃ সহীহ বুখারীতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দীর্ঘ হাদীসে এসেছে,

وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَا هُنَا فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى

‘‘আমরা এক শায়িত ব্যক্তির কাছে আসলাম। তার মাথার কাছে পাথর হাতে নিয়ে অন্য একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়ানো ব্যক্তি শায়িত ব্যক্তির মাথায় সেই পাথর নিক্ষেপ করছে। পাথরের আঘাতে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং পাথরটি বলের মত গড়িয়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। লোকটি পাথর কুড়িয়ে আনতে আনতে আবার তার মাথা ভাল হয়ে যাচ্ছে। দাঁড়ানো ব্যক্তি প্রথমবারের মত আবার আঘাত করছে এবং তার মাথাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সফরসঙ্গী ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কি অপরাধের কারণে তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে? উত্তরে তারা বললেনঃ এ ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করেছিল। কিন্তু কুরআন অনুযায়ী আমল করেনি এবং সে ফরজ সলাতের সময় ঘুমিয়ে থাকত। কিয়ামত পর্যন্ত তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হবে।[35]

---

[34] আহমাদ ৩/২২৪

[35] সহীহ বুখারী তাও হা/৭০৪৭

৪. সুদখোরের শাস্তিঃ সহীহ বুখারীতে সামুরা বিন জুনদুব রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে রসূল সাঃ এর দীর্ঘ হাদীসে এসেছে,

فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُل قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا

‘‘আমরা একটি রক্তের নদীর কাছে আসলাম। দেখলাম নদীতে একটি লোক সাঁতার কাটছে। নদীর তীরে অন্য একটি লোক কতগুলো পাথর একত্রিত করে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সাঁতার কাটতে কাটতে লোকটি যখন নদীর কিনারায় পাথরের কাছে দাঁড়ানো ব্যক্তির নিকটে আসে তখন দাঁড়ানো ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। পাথর মুখে নিয়ে লোকটি আবার সাঁতরাতে শুরু করে। যখনই লোকটি নদীর তীরে আসতে চায় তখনই তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কারণ জানতে চাইলে ফেরেশতাদ্বয় বললেনঃ এরা হলো আপনার উম্মতের সুদখোর’’।[36]

আর একটু অগ্রসর হয়ে দেখি যে, কতকগুলি লোকের পেট বড় বড় ঘরের মত। যখন উঠতে চাচ্ছে তখন পড়ে যাচ্ছে এবং বার বার বলছে “হে আল্লাহ! কিয়ামত যেন সংঘটিত না হয়।” ফিরআউনী জন্তুগুলি দ্বারা তারা পদদলিত হচ্ছে। আর তারা আল্লাহ তা’আলার সামনে হা-হুতাশ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ এরা কারা? জবাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ এরা হচ্ছে আপনার উম্মতের ঐ সব লোক যারা সুদ খেতো। সুদখোররা এ লোকদের মতই দাঁড়াবে যাদেরকে শয়তান পাগল করে রেখেছে।”

৫. যাকাত অনাদায়কারীর শাস্তিঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ “এমন কতকগুলি লোককে আমি দেখলাম যাদের সামনে ও পিছনে বস্ত্র খণ্ড লটকানো আছে এবং তারা উট ও অন্যান্য জন্তুর মত জাহান্নামের কাঁটাযুক্ত গাছ খাচ্ছে এবং দোযখের পাথর ও অঙ্গার ভক্ষণ করছে। আমি প্রশ্ন করলামঃ এরা কারা? উত্তরে তিনি (জিবরাঈল আঃ) বললেনঃ “এরা ঐ সব লোক যারা তাদের মালের যাকাত প্রদান করতো না। আল্লাহ তাদের উপর যুলুম করেন নাই, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করতো।”

---

[36] সহীহ বুখারী মাশা হা/৬৬৪০

৬. ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎকারীর শাস্তিঃ তাদের ঠোঁটের আকার আকৃতি ছিল উটের ঠোঁটের মত। তারা পাথরের টুকরোর মত আগুনের ফুলকী মুখের মধ্যে পুরছিল এবং সেগুলো পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হচ্ছিল। তারা ভীষণ চীৎকার করছে এবং মহান আল্লাহর সামনে মিনতি করছে। মুহাম্মাদ সাঃ জিজ্ঞেস করলেনঃ “এরা কারা?” জবাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ “এরা আপনার উম্মতের ঐসব লোক যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতো। যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে খায় তারা নিজেদের পেটের মধ্যে আগুন ভরে দিচ্ছে এবং অবশ্য অবশ্যই তারা জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করবে।”

৭. তিনি ব্যভিচারী নারী পুরুষের শাস্তি দেখেছেন। সহীহ বুখারীতে সামুরা বিন জুনদুব রাঃ হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর দীর্ঘ হাদীসে কবরে ব্যভিচারীর ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা এসেছে। তিনি বলেনঃ

فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قَالَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللهَبُ ضَوْضَوْا

‘‘আমরা একটি তন্দুর চুলার নিকট আসলাম। যার উপরিভাগ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশ ছিল প্রশস্ত। তার ভিতরে আমরা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। দেখতে পেলাম তাতে রয়েছে কতগুলো উলঙ্গ নারী-পুরুষ। তাদের নিচের দিক থেকে আগুনের শিখা প্রজ্বলিত করা হচ্ছে। অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হওয়ার সাথে সাথে তারা উচ্চঃস্বরে চিৎকার করছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কারণ জানতে চাইলে ফেরেশতাদ্বয় বললেনঃ এরা হলো আপনার উম্মতের ব্যভিচারী নারী-পুরুষ’’। (বুখারী)

ব্যভিচারীর শাস্তির অন্য একটি চিত্রঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মে'রাজের রাত্রিতে একদল লোকের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন তাদের সামনে একটি পাত্রে গোশত রান্না করে রাখা হয়েছে। অদূরেই অন্য একটি পাত্রে রয়েছে পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত কাঁচা গোশত। লোকদেরকে রান্না করে রাখা গোশত থেকে বিরত রেখে পঁচা এবং দুর্গন্ধযুক্ত কাঁচা গোশত খেতে বাধ্য করা হচ্ছে। তারা চিৎকার করছে এবং একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও তা থেকে ভক্ষণ করছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীল ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ এরা কোন শ্রেণীর লোক? জিবরীল বললেনঃ এরা আপনার উম্মতের ঐ সমস্ত পুরুষ লোক যারা নিজেদের ঘরে পবিত্র এবং হালাল স্ত্রী থাকা সত্বেও অপবিত্র এবং খারাপ মহিলাদের সাথে রাত্রি যাপন

করত।[37]এই হাদীসের মূল বিষয় বস্তু অন্য এক বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। তবে উল্লেখিত হাদীসটি দুর্বল।

আরো কিছু দূর গিয়ে দেখি যে, কতকগুলি স্ত্রী লোক নিজেদের বুকের ভরে লটকানো রয়েছে এবং হায়! হায়! করছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ "এরা হচ্ছে আপনার উম্মতের ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক।"

৮. রাস্তার ঘিরে বসে থাকা লোকদের শাস্তিঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দেখেন যে, পথে একটি কাঠ রয়েছে এবং ওটা প্রত্যেক কাপড়কে ছিঁড়ে দিচ্ছে এবং প্রত্যেক জিনিসকে যখম করছে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ এটা কি? জবাবে হযরত.জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ "এটা হচ্ছে আপনার উম্মতের ঐ লোকদের দৃষ্টান্ত যারা রাস্তা ঘিরে বসে যায়।" অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করলেনঃ

وَلَا تَقْعُدُوا۟ بِكُلِّ صِرَٰطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ

অর্থাৎ "তোমরা লোকদেরকে ভীত করা ও আল্লাহর পথ হতে বাধা দানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাস্তার উপর বসো না।(৭:৮৬)

৯. মানুষের হক্ক নষ্ট করা ব্যক্তির শাস্তিঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ "আমি দেখলাম যে, একটি লোক এক বিরাট স্তুপ জমা করেছে যা সে উঠাতে পারছে না। অথচ আরো বাড়াচ্ছে। আমি প্রশ্ন করলামঃ এটা কে? জবাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ "এটা হচ্ছে আপনার উম্মতের ঐ লোক যার উপর মানুষের এতো বেশী হক বা প্রাপ্য রয়েছে যা আদায় করার ক্ষমতা তার নেই, তথাপি নিজের উপর আরো প্রাপ্য বাড়িয়ে চলেছে এবং জনগণের আমানত গ্রহণ করতেই আছে।"

১০. ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টিকারী বক্তা ও উপদেষ্টাঃ তারপর আমি এমন একটি দল দেখলাম যাদের জিহবা ও ঠোঁট লোহার কেচি দ্বারা কর্তন করা হচ্ছে। একদিক কর্তিত হচ্ছে এবং অপর দিকে ঠিক হয়ে যাচ্ছে, আবার এ দিক কর্তিত হচ্ছে। এই অবস্থায়ই অব্যাহত রয়েছে। জিজ্ঞেস

---

[37] আল-খুতাবুল মিম্বারিয়াহ, ডঃ সালেহ ফাওযান

করলামঃ এরা কারা? হযরত জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে বললেনঃ এরা হচ্ছে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টিকারী বক্তা ও উপদেষ্টা।”

তারপর দেখি যে, একটি ছোট পাথরের ছিদ্র দিয়ে একটি বিরাট বলদ বের হচ্ছে এবং আবার তাতে ফিরে যেতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে জিবরাঈল (আঃ)! এটা কে? জবাবে তিনি বললেনঃ “যে মুখে খুব বড় বড় বুলি আওড়াতো, তারপর লজ্জিত হতো বটে, কিন্তু ওর থেকে ফিরতে পারতো না।”

মে’রাজ সংক্রান্ত বহুল জিজ্ঞাসিত কিছু প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্নঃ ২৭শে রজব কি মে'রাজ সংঘটিত হয়েছিল?

উত্তরঃ ইমাম কুরতুবী (রহ.) স্বীয় তাফসির গ্রন্থে বলেন, মে'রাজের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। মুসা ইবনে ওকবার রেওয়ায়েত এই যে ঘটনাটি হিজরতের ছয় মাস আগে সংঘটিত হয়। হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, হজরত খাদিজার ওফাত নামাজ ফরজ হওয়ার আগে হয়েছিল। ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন, হজরত খাদিজার ওফাত নবুওয়াতপ্রাপ্তির সাত বছর পরে হয়েছিল। মুহাদ্দেসগণ বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ করার পর কোনো সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেননি। (মা'আরিফুল কোরআন)

এ থেকে বোঝা যায়, শবেমে'রাজ, শবেকদরের মতো বিশেষ রাত নয়। মে'রাজ রজনী শবেকদরের মতো হলে এর মাস তারিখ সংরক্ষণেও গুরুত্ব দেওয়া হতো। যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শবেকদরের। যেহেতু এ রাতের তারিখ সংরক্ষিত নেই, তাই ২৭ তারিখকে শবেমে'রাজ নির্ধারণ করাও কঠিন।

ওই রাতই ফজিলতপূর্ণ ছিল। মেনেও যদি নিই ২৭ রজবে মে'রাজ সংঘটিত হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা রাসুল (সা.)-কে বিশেষ নৈকট্য দান করেন। মুসলমানদের নামাজ উপহার দেন। তাহলে নিঃসন্দেহে ওই রাতই ছিল ফজিলতপূর্ণ। এই রাতের ফজিলত নিয়ে কোনো মুসলমানের সন্দেহ থাকতে পারে না। তবে এই ফজিলত প্রতি বছরের ২৭ রজবের নয়।

তথ্যসূত্রঃ https://www.kalerkantho.com/print-edition/dhormo/2014/05/23/87496

প্রশ্নঃ মি'রাজের রাত্রে নাবী (সাঃ) কি আল্লাহকে দেখেছেন?

উত্তরঃ মে'রাজের রাতে নাবী (সাঃ) আল্লাহকে দেখেছেন কি না, এই ব্যাপারে সাহাবীগণ মতভেদ করেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আল্লাহকে দেখেছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে সহীহ সনদে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আল্লাহকে অন্তর দিয়ে দেখেছেন। আয়িশা এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ দেখার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তারা উভয়েই বলেন- وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى "নিশ্চয়ই তিনি তাকে আরেকবার দেখেছেন"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জিবরীল। আবু যার (রাঃ) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসূল সাঃ কে জিজ্ঞেস করেছেনঃ আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? উত্তরে তিনি বলেছেন- আমি তো নূর দেখেছি। তাঁকে কিভাবে দেখব? অর্থাৎ রসূল সাঃ এর মাঝে এবং তাঁর রবের মাঝে নূরের একটি পর্দা অন্তরায় হয়েছিল। অন্য শব্দে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সাঃ বলেন- আমি একটি নূর দেখেছি। ইমাম দারামী না দেখার ব্যাপারে সাহাবীদের ইজমা বর্ণনা করেছেন।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহঃ) বলেন- ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর কথা, তিনি তাঁর রবকে দেখেছেন এবং তিনি তাঁকে তাঁর অন্তর দিয়ে দেখেছেন- এই কথা দু'টি পরস্পর বিরোধী নয়। কেননা রসূল সাঃ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন- আমি আমার সুমহান ও বরকতময় রবকে দেখেছি। এটি মে'রাজের রাতের ঘটনা নয়; এটি মদ্বীনায় হিজরতের পর স্বপ্নযোগে সংঘটিত হয়েছে।

এর উপর ভিত্তি করেই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন- নাবী সাঃ সত্যিই তাঁর রবকে দেখেছেন। কেননা নাবীদের স্বপ্নও সত্য হয় এবং অবশ্যই তা বাস্তবে পরিণত হয়। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) এটি বলেন নি যে, তিনি জাগ্রত অবস্থায় চর্মচক্ষু দিয়ে দেখেছেন।

যারা তাঁর থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, তারা ভুল করেছেন। কিন্তু তিনি একবার বলেছেন- মুহাম্মাদ সাঃ তাঁর রবকে দেখেছেন। আরেকবার বলেছেন- অন্তর দিয়ে দেখেছেন। সুতরাং তাঁর থেকে দু'টি বর্ণনা এসেছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল থেকে তৃতীয় আরেকটি বর্ণনা এসেছে যে, তিনি তাঁর রবকে কপালের চোখ দিয়ে দেখেছেন। এটি তাঁর কতিপয় ছাত্রের অতিরঞ্জিত বর্ণনা। এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ (রহঃ) এর সুস্পষ্ট উক্তি রয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে তৃতীয় বর্ণনাটি পাওয়া যায়না।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- তিনি তাঁর রবকে অন্তর দিয়ে দুইবার দেখেছেন। তিনি আল্লাহর এই বাণী দিয়ে দলীল গ্রহণ করেছেনঃ

كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى - أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى - وَلَقَدْ رَآهُ نزلَةً أُخْرَى

"রসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। তোমরা কি সে বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে? নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল"। (সূরা নাজম-৫৩:১১-১৩) প্রকাশ্য কথা এই যে, তিনি এই আয়াতগুলো দিয়েই দলীল গ্রহণ করেছেন। নাবী সাঃ থেকে এ বিষয়ে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, এই আয়াতে যাকে দেখার কথা বলা হয়েছে তিনি হচ্ছেন জিবরীল। নাবী সাঃ তাঁকে আসল আকৃতিতে দুইবার দেখেছেন। ইবনে আব্বাসের এ কথাই অর্থাৎ তিনি তার রবকে অন্তর দিয়ে দুইবার দেখেছেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের দলীল। তিনি বলেন- মুহাম্মাদ সঃ তাঁর রবকে অন্তরের চোখ দিয়ে দেখেছেন; কপালের চোখ (চর্মচোখ) দিয়ে নয়।*

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى "অতঃপর নিকটবর্তী হল ও ঝুলে গেল"। এখানে যেই নিকটবর্তী হওয়ার কথা বলা হয়েছে তার সম্পর্ক সূরা ইসরাতে বর্ণিত মে'রাজের ঘটনার সাথে নয়। সুতরাং কুরআনে বর্ণিত নিকটবর্তী হওয়া দ্বারা জিবরীলের নিকটবর্তী হওয়া উদ্দেশ্য। আয়িশা ও ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর বিবরণ থেকেও তাই বুঝা যায়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এর আগে বলেন-

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى - ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى - وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى

"তাঁকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী ফিরিস্তা। সহজাত শক্তিসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল। তখন সে ছিল উর্ধ্ব দিগন্তে"। (সূরা নাজম-৫৩: ৫-৭)

আর হাদীসে যেই নিকটবর্তী হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাতে সুস্পষ্ট যে, তিনি তাঁর মহান রবের নিকটবর্তী হয়েছিলেন। সুতরাং সূরা নাজমের ঘটনার সাথে হাদীসে বর্ণিত মে'রাজের ঘটনার কোন দ্বন্দ নেই। সূরা নাজমে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী সাঃ জিবরীলকে দুইবার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। একবার আকাশে সিদরাতুল মুনতাহায়। আরেকবার যমীনে।

এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হাদীসটি উল্লেখ করা হলো[38]

---

[38] সহীহ মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৩৩৬, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৭৭

যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ... মাসরুক (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাঃ) এর কাছে হেলান দিয়ে বসেছিলাম। তখন তিনি বললেন, হে আবূ আয়িশা! তিনটি কথা এমন, যে এর কোন একটি বলল, সে আল্লাহ সম্পর্কে ভীষণ অপবাদ দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেগুলো কি? তিনি বললেন, যে এ কথা বলে যে, মুহাম্মাদ তার প্রতিপালককে দেখেছেন, সে আল্লাহর উপর ভীষণ অপবাদ দেয়। আমি তো হেলান অবস্থায় ছিলাম, এবার সোজা হয়ে বসলাম। বললাম, হে উমুল মু"মিনীন! থামুন। আমাকে সময় দিন, ব্যস্ত হবেন না। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কি ইরশাদ করেননিঃ "তিনি (রাসুল) তো তাঁকে (আল্লাহকে) স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন, (২৩ঃ ৮১), অন্যত্র "নিশ্চয়ই তিনি তাকে আরেকবার দেখেছিলেন" (৫৩ঃ ১৩)

আয়িশা (রাঃ) বললেন, আমিই এ উম্মতের প্রথম ব্যাক্তি, যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেনঃ তিনি তো ছিলেন জিবরীল (আলাইহিস সালাম) কেবলমাত্র এ দু-বারই আমি তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছি। আমি তাঁকে আসমান থেকে অবতরণ করতে দেখেছি। তাঁর বিরাট দেহ ঢেকে ফেলেছিল আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সবটুকু স্থান।

আয়িশা (রাঃ) আরও বলেন, তুমি কি শোননি? আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ তিনি (আল্লাহ) দৃষ্টির অধিগম্য নন, তবে দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত এবং তিনই সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক পরিজ্ঞাত" (৬ঃ ১০৩) এরুপ তুমি কি শোননি? আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত ও প্রজ্ঞাময়" (৪২ঃ ৫১)।

আয়িশা (রাঃ) বলেন, আর ঐ ব্যক্তিও আল্লাহর উপর ভীষণ অপবাদ দেয়, যে এমন কথা বলে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কিতাবের কোন কথা গোপন রেখেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ হে রাসুল!

আপনার প্রতিপালকের কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন, যদি তা না
করেন তবে আপনি তার বার্তা প্রচারই করলেন না। (৫ঃ ৬৭)

তিনি (আয়িশা রাঃ) আরো বলেন, যে ব্যক্তি এ কথা বলে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ওহী ব্যতীত কাল কি হবে তা অবহিত করতে পারেন, সেও আল্লাহর উপর ভীষন অপবাদ দেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "বল, আসমান ও যমীনে আল্লাহ ব্যতীত গায়েব সম্পর্কে কেউ জানে না।" (২৭ঃ ৬৫)

তথ্যসুত্রঃ https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3910

প্রশ্নঃ মে'রাজ কি সশরীরে হয়েছিল?

উত্তরঃ ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقَظَةِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْعُلَا وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى

আর মে'রাজ সত্য, নাবী সাঃ কে রাতের বেলা আকসায় ভ্রমণ করানো হয়েছে। অতঃপর তাকে জাগ্রত অবস্থায় স্ব-শরীরে উর্ধ্ব আকাশে উত্থিত করা হয়েছে। সেখান থেকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে আরো উর্ধ্বে নেয়া হয়েছে। সেখানে আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছা অনুসারে তাকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং তাকে যা প্রত্যাদেশ করার ছিল তা করেছেন। তিনি যা দেখেছেন তার অন্তর তা মিথ্যা বলেনি। আল্লাহ তার উপর আখেরাতে এবং দুনিয়ার জগতে সালাত (দরুদ) ও সালাম নাযিল করুন।

ব্যাখ্যা: المعراج শব্দটি مفعال এর ওজনে ব্যবহৃত হয়েছে। উপরে উঠার যন্ত্রকে المعراج বলা হয়। এটি সিড়ির মতই। কিন্তু তা কেমন, তা জানা সম্ভব নয়। এর হুকুম অন্যান্য গায়েবী বিষয়ের হুকুম একই রকম। আমরা এগুলোর উপর ঈমান আনয়ন করি। কিন্তু এগুলোর কাইফিয়্যাত জানার চেষ্টা করি না। ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, নাবী সাঃ কে স্ব-শরীরে জাগ্রত অবস্থায় রাতের বেলায় বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছে। আলেমগণ এ ইসরা বা রাতের ভ্রমণ সম্পর্কে মতভেদ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, ইসরা হয়েছিল 'রূহ' এর মাধ্যমে। ঐ রাতে তার শরীর থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হয়নি। ইবনে ইসহাক আয়েশা ও মুআবিয়া রাঃ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে ইসরা ও মে'রাজ হয়েছিল স্বপ্নযোগে অথবা শরীর ব্যতীত শুধু 'রূহ' এর মাধ্যমে, -এ দু'কথার মধ্যকার পার্থক্য জানা আবশ্যক। উভয় কথার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আয়েশা ও মুআবিয়া রাঃ এ কথা বলেননি যে, ইসরা ও মে'রাজ হয়েছিল স্বপ্নযোগে। তারা কেবল বলেছেন, 'রূহ' এর মাধ্যমে মে'রাজ হয়েছে। ঐ রাতে তার পবিত্র দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হয়নি। সুতরাং যারা স্বপ্নযোগে মে'রাজ হওয়ার কথা বলেছে তাদের কথার মধ্যে এবং আয়েশা ও মুআবিয়া রাঃ কথার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে যা দেখে, তা কখনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জানা বিষয়ের উদাহরণ স্বরূপ পেশ হয়। যেমন কেউ দেখল যে, সে আকাশে উড়ছে, মক্কায় যাচ্ছে। অথচ তার রূহ উপরে উঠেনি এবং মক্কা যায়নি। স্বপ্নের ফেরেশতা কেবল তার জন্য একটি উদাহরণ পেশ করেছে। সুতরাং আয়েশা রাঃ

এটি উদ্দেশ্য করেননি যে, মে'রাজ হয়েছিল রুহের মাধ্যমে; বরং তার এ কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল, মে'রাজ হয়েছিল 'রূহ' সহকারে। রূহ প্রথমে দেহ থেকে আলাদা হয়েছিল, অতঃপর দেহের মধ্যে ফিরে এসেছে। আয়েশা ও মুআবিয়া রাঃ এটিকে একমাত্র নাবীর সাঃ বৈশিষ্ট্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি ছাড়া অন্যদের রূহ মৃত্যুর পূর্বে আসমানে পরিপূর্ণরূপে আরোহন করার মর্যাদা অর্জন করতে পারবে না।

ইসরা বা রাতের ভ্রমণের ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, তাকে রাতের বেলা জাগ্রত অবস্থায় মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল। জিবরীলের সঙ্গে বোরাকের উপর আরোহন করে তিনি বাইতুল মাকদিসে গিয়ে নামলেন। বাইতুল মাকদিসে নেমে তিনি নাবীদের ইমাম হয়ে স্বলাত পড়ালেন। এ সময় মসজিদের দরজার হাতলের সাথে বোরাক বেধেছিলেন।

অতঃপর সেই রাতে বাইতুল মাকদিস থেকে তাকে প্রথমত দুনিয়ার আসমানে উঠানো হয়েছিল। এরপর পর্যায়ক্রমে তিনি বাকি আসমানগুলো ভ্রমণ করেন এবং সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়ে পৌঁছেন।

তথ্যসুত্রঃ http://hadithbd.com/books/detail/?book=63&section=855

প্রশ্নঃ মে'রাজ কতবার সংঘটিত হয়েছিল?

উত্তরঃ ইমাম ইবনু আব্দুল বার (রহঃ) বলেন- হিজরতের এক বছর একমাস পূর্বে মে'রাজ ও ইসরা সংঘটিত হয়েছিল।[1] আর মে'রাজ হয়েছিল মাত্র একবার। কেউ কেউ বলেছেন- দুইবার। একবার সশরীরে জাগ্রত অবস্থায়। আরেকবার স্বপ্নে। যারা দুইবারের কথা বলেছেন- সম্ভবতঃ তারা শারীকের হাদীস এবং নাবী সাঃ এর বাণী- অতঃপর আমি জাগ্রত হলাম। তখন আমি মসজিদে ছিলাম এবং অন্যান্য সকল বর্ণনার মাঝে সমন্বয় করতে চেয়েছেন।

আবার কেউ বলেছেন- মে'রাজ হয়েছিল দুইবার। একবার নবুওয়াতের পূর্বে। যেমন শারীকের হাদীছে এসেছে, وذلك قبل أن يُوحَى إليه অর্থাৎ এটি ছিল তাঁর নিকট অহী নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। আরেকবার হয়েছিল নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে। যেমনটি প্রমাণ করে অন্যসব হাদীস।

আবার কেউ বলেছেন মে'রাজ হয়েছে তিনবার। একবার অহী নাযিল শুরু হওয়ার পূর্বে। দুইবার নবুওয়াত পাওয়ার পরে। এ সব কথা শুধু অনুমান ভিত্তিক। এগুলো যাহেরী মাজহাবের দুর্বল

বর্ণনাকারীদের কাজ। তারা যখন কোন ঘটনায় বর্ধিত কোন শব্দ পেয়েছে সেটিকেই আলাদা একটি বর্ণনা মনে করেছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধপূর্ণ বর্ণনাগুলোর প্রত্যেকটিকে তারা আলাদা আলাদা ঘটনা বলে বর্ণনা করেছে।

সঠিক কথা হচ্ছে মক্কাতে নবুওয়াতের পর মাত্র একবার মে'রাজ হয়েছে। এটিই মুহাদ্দেছীন ও গ্রহণযোগ্য ইমামদের মত। সুতরাং যারা বলে একাধিকবার মে'রাজ হয়েছে, তাদের জন্য আফসোস। তারা কিভাবে ধারণা করতে পারে যে, নাবী সাঃ এর উপর প্রত্যেকবার পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফরয করা হয়েছে? অতঃপর তিনি তাঁর রব ও মূসার মাঝে যাওয়া-আসা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত হয়েছে। মে'রাজের হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীসের হাফিয ও বিশেষজ্ঞগণ শারীককে ভুলকারী হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

ইমাম মুসলিম সেই হাদীসকে সনদ সহকারে বর্ণনা করে বলেন- শারীক এই হাদীসের শব্দসমূহের একটিকে অন্যটির পূর্বে বা পরে এবং বাড়িয়ে ও কমিয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। ইমাম মুসলিম (রহঃ) সঠিক এবং অত্যন্ত উত্তম কথা বলেছেন।[39]

প্রশ্নঃ শবে মে'রাজের নামায কত রাকাত?

উত্তরঃ রাসূল সাঃ এর মে'রাজ হয়েছিল হিজরতের আগে। এর পরে তিনি আরো অনেক বছর দুনিয়াতে ছিলেন, এই বছরগুলোতে কোনো সময় তিনি শবে মে'রাজ উপলক্ষে বিশেষ কোনো নামায পড়েছেন বা সাহাবীরা পড়েছেন এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। অতএব শবে মে'রাজ উপলক্ষে যে নামায পড়া হয় তা বেদআত। তবে অন্যান্য রাতের মতই এই রাতেও নফল নামায আদায় করা যাবে এবং এতে নফয নামাযের হওয়াব হাসিল হবে ইন সা আল্লাহ যদি না তা শবে মে'রাজ উপলক্ষে হয়।

প্রশ্নঃ রজব মাস সম্পর্কে যেসব হাদিছ বর্ণিত তা সহিহ কিনা?[40]

---

[39] তথ্যসূত্রঃ https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3910

[40] তথ্যসূত্রঃ https://rb.gy/8kt4x

উত্তরঃ রজব মাসের ১ম তারিখ ও ১ম শুক্রবার, ১০ ও ১৫ এবং ২৭ তারিখ শবে মে'রাজে রোযা রাখা, সালাতুর রাগায়েব নামক বিশেষ প্রকৃতির নামায পড়া সংক্রান্ত সকল হাদীসই জাল ও বানোয়াট।

فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به و الأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب و باطل لا تصح و هذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء و من ذكر ذلك من أعيان العلماء المتأخرين من الحفاظ أبو إسماعيل الأنصاري و أبو بكر بن السمعاني و أبو الفضل بن ناصر و أبو الفرج بن الجوزي و غيرهم إنما لم يذكرها المتقدمون لأنها أحدثت بعدهم و أول ما ظهرت بعد الأربعمائة فلذلك لم يعرفها المتقدمون و لم يتكلموا فيها و أما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا عن أصحابه (لطائف المعارف، ذكر ما يتعلق برجب من أحكام-131)

অনুবাদ-মাহে রজবে বিশেষ কোন নামায প্রমাণসিদ্ধ নয়, রজবের প্রথম শুক্রবারে সালাতুর রাগায়েবের ফযীলত সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ বাতিল, মিথ্যা ও বানোয়াট। বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের মতে এটি একটি নব আবিস্কৃত নামায। পরবর্তী যুগের অগাধ জ্ঞানের অধিকারী বিদগ্ধ ওলামায়ে কিরাম যারা এটি বিদআত আখ্যা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন আবু ইসমাঈল আনসারী, আবু বকর ইবনে সামআনী, আবুল ফযল ইবনে নাসের ও আবুল ফারায বিন জাওযী রহঃ প্রমূখ।

পূর্ববর্তীরা এ নিয়ে আলোচনা করেননি। কেননা তাদের [ইন্তেকালের বেশ] পরে তা আবিস্কৃত হয়েছে। চারশত হিজরীরও পরে এটির প্রকাশ ঘটে। তাই পূর্ববর্তীদের নিকট এটির পরিচয় ঘটেনি এবং তারা এ ব্যাপারে কিছু বলে যাননি।

আর রোযা! রজব মাসের রোযার বিশেষ ফযীলতের কথা রাসূল সাঃ থেকে প্রমানিত নয়, সাহাবীদের থেকেও নয়। (লাতায়েফুল মাআরিফ-১৩১)

আল্লামা ইমাম নববী রহঃ রজব মাসের সালাতুর রাগায়েব ও শবে বরাতের রাতে বিশেষ পদ্ধতির নামাযকে বিদআত আখ্যা দেওয়ার পর বলেন-

ولا يغتر بذكرهما فى كتاب قوت القلوب، وإحياء عليوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل، (المجموع شرح المهذب-3/549

অনুবাদ-আবু তালেব মক্কী রহঃ কুতূল কুলূব এ এবং ইমাম গাজ্জালী রহঃ ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে এ নামায দু'টি এবং সাথে এ সংক্রান্ত হাদীস উল্লেখ করার কারণে ধোঁকায় পড়বেন না। কেননা এ সবগুলোই বাতিল ও ভিত্তিহীন।{আল মাজমাউ শরহুল মুহাযযাব-৩/৫৪৯)

রজব মাস এবং শবে মে'রাজের নামায-রোযা সম্পর্কে জাল বর্ণনাসূহের অসারতা আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখা যেতে পারে-

তাবয়ীনুল আজব-

মাসাবাতা বিস সুন্নাহ ফী আয়্যামিস সান্াহ

আল মওযূয়াত-২/৪৬-৪৯, আল মানারুল মুনীফ-৯৫-৯৭, তাখরীজে ইহইয়া ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন-১/২৯৬, আল লাআলিল মাসনূআ-২/৫৫-৫৯, তানযীহুশ শরীয়া-২/৮৯-৯০, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন-৩/৪২২-৪২৫, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ-১/৭৩-৭৫, আল আসারুল মারফূআ-৫৮-৭০

তবে রজব মাস সম্পর্কিত নিম্নের হাদীসটি দুর্বল হলেও জাল তথা বানোয়াট নয়।

عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان

হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ রজব মাস আসলে পড়তেন-আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রাজাবা ওয়া শা’বানা ওয়া বাল্লিগনা রামাদ্বান। {মু’জামে ইবনে আসাকীর, হাদীস নং-৩০৯, মুসনাদুল বাজ্জার, হাদীস নং-৬৪৯৪, শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-৩৫৩৪, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২৩৪৬}

প্রশ্নঃ “স্বলাত মু’মিনের মে’রাজ” কথাটি কতখানি সত্যি?

উত্তরঃ একটি অতি প্রচলিত ভিত্তিহীন সনদহীন জাল হাদীস

اَلصَّلاَةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ

‘‘নামায মুমিনদের মে'রাজ।’’

এখানে লক্ষণীয় যে, এ অর্থের কাছাকাছি অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। মুমিন সালাতের মধ্যে আল্লাহর সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করেন, সালাতে দাঁড়ালে আল্লাহ মুমিনের দিকে তাকিয়ে থাকেন... ইত্যাদি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এগুলোর পরিবর্তে অনেকে এ ভিত্তিহীন কথাটিকে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর নামে বলে তাঁর নামে মিথ্যা বলার অপরাধে অপরাধী হয়ে যান।

প্রশ্নঃ রজব মাসের বিশেষ কোনো ইবাদাত আছে কি?

কিছু লোক রজব মাসকে কিছু ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে থাকে। যেমন, রাগায়েবের সালাত এবং ২৭শে রজবের রাত্রি জাগরণ। শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি আছে কি?

উত্তর: রাগায়েবের সালাত বা ২৭ শে রজবে উৎসব পালন করা এই ধারণায় যে, এ তারিখে ইসরা এবং মে'রাজ হয়েছে, এ সবই বিদ‘আত। শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। বিজ্ঞ আলেমগণ এ থেকে সতর্ক করেছেন যে রাগায়েবের সালাত বিদ‘আত। কিছু লোক রজব মাসের প্রথম জুম‘আ

রাত্রিতে তা করে থাকে। এমনিভাবে ২৭ শে রজবে উৎসব পালন করে থাকে এ ধারণায় যে, এ তারিখে ইসরা এবং মে'রাজ হয়েছে এ সবই বিদ‘আত, শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই।

ইসরা এবং মে'রাজের সঠিক তারিখ জানা যায় না, যদি জানাও যায় তাহলে এ নিয়ে উৎসব পালন করা জায়েয নেই কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তা পালন করেননি, তদ্রূপ তাঁর সুপথ প্রাপ্ত খলিফাগণ এবং বাকী অন্যান্য সাহাবীগণও কখনো তা পালন করেননি। যদি তা পালন করা সুন্নাত হত তাহলে তারা অবশ্যই করতেন।

তাদের অনুসরণ এবং তাদের পথে চলার মধ্যেই সকল কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٠٠ ﴾ [التوبة: ١٠٠]

“আর যারা সর্ব প্রথম হিজরতকারী, আনসার এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সকল লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন সেই জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদীসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই হলো মহা কৃতকার্যতা। টীকা [সূরা তাওবা/১০০]

এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সনদে এসেছে যে, তিনি বলেছেন: “যে ব্যক্তি আমার এ দ্বীনের মধ্যে নতুন কোনো জিনিস সৃষ্টি করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।”

তিনি আরও বলেন : “যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করবে যা আমার শরিয়ত সমর্থিত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।”

এবং তিনি তাঁর জুম‘আর খুৎবায় বলেছেন,

“অতঃপর সর্বোত্তম বাণী হলো: আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম হেদায়েত হলো: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হেদায়েত, আর নিকৃষ্টতর কাজ হলো এর নব আবিষ্কৃত কাজ, এবং প্রতিটি বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা।”

কাজেই সকল মুসলিমের উচিৎ হলো: সুন্নাতের অনুসরণ করা এবং এর উপর দৃঢ় থেকে পরস্পরে নসিহত গ্রহণ করা এবং সকল প্রকার বিদ‘আত থেকে সতর্ক থাকা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ এবং সেই বাণীর উপর আমল করার লক্ষ্যে যেখানে আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ﴾ [المائدة: ٢]

“তোমরা পরস্পরে ভালো এবং তাকওয়াপূর্ণ কাজে সহযোগিতা কর।” টীকা [সূরা মায়েদা/২]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣ ﴾ [العصر: ١، ٣]

“কসম যুগের, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে হক্কের তাকীদ করে এবং তাকীদ করে ধৈর্যের।” (সূরা আসর ১-৩)

তবে রজব মাসে উমরা করাতে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে সাব্যস্ত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজব মাসে উমরা করেছেন এবং সালাফগণও রজব মাসে উমরা করতেন। যেমন হাফেয ইবনে রজব তার কিতাব (আল লাতায়েফ) এ উমর, তার ছেলে আব্দুল্লাহ এবং আয়েশার হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে সিরিন হতে বর্ণিত আছে যে, সালাফগণও এ রকম করেছেন।

তথ্যসূত্রঃ https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=131&section=1661

মে'রাজ বিষয়ক জাল ও ভিত্তিহীন ধারণা

ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মি'রাজ বিষয়েও বিবিধ বিভ্রান্তি বিদ্যমান। একদিকে খারিজী, মু'তাযিলী ও সমমনা গোষ্ঠীগুলো যুক্তি, বিজ্ঞান বা দর্শনের নামে কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীসে উল্লেখিত ও বর্ণিত ঘটনাবলি অস্বীকার করেছে এবং ব্যাখ্যার নামে প্রকাশ্য অর্থ বাতিল করেছে। অপরদিকে শীয়াগণ এবং সুন্নী সমাজের শীয়া প্রভাবিত অনেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠী এ বিষয়ে অনেক জাল ও বানোয়াট কাহিনী প্রচার করেছে। তারা এ বিষয়ক কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীসে বিধৃত বিষয়গুলোর প্রতি তেমন গুরুত্ব দেন না। বরং তাদের প্রচারিত জাল ও বানোয়াট কাহিনীগুলোকেই ''মে'রাজ''-এর মূল বিষয় বলে বিশ্বাস ও প্রচার করে।

জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে আমরা মে'রাজ বিষয়ক অনেক জাল হাদীস দেখতে পাই। মে'রাজের রাত্রিতে জান্নাতের সকল স্থানে ফাতিমা (রা), আলী (রা) ও তাঁর পরিবারের 'পাক পাঞ্জাতনের' নাম দেখা, তাদের ইমামতের সাক্ষ্য দেখা ইত্যাদি বিষয় এ সকল হাদীসের প্রতিপাদ্য। এ জাতীয় কিছু জাল হাদীস রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আরশে আরোহণ কেন্দ্রিক।

কুরআনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সিদরাতুল মুনতাহার নিকট আল্লাহর মহান নিদর্শনাবলির দর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করে আরশে গমনের কথা উল্লেখ করা হয় নি। সিহাহ সিত্তা ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থের হাদীসগুলোতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মে'রাজের রাত্রিতে আরশে গমন করেছেন বলে উল্লেখ করা হয় নি। রাফরাফে চড়া, আরশে গমন করা ইত্যাদি কোনো কথা সিহাহ সিত্তা, মুসনাদে আহমদ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ কোনো হাদীস-গ্রন্থে সংকলিত কোনো হাদীসে নেই। ৫/৬ শতাব্দী পর্যন্ত সংকলিত ইতিহাস ও সীরাত বিষয়ক গ্রন্থগুলোতেও এ বিয়য়ে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। দশম হিজরী শতাব্দী ও পরবর্তী যুগে সংকলিত সীরাতুন্নবী বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থে রাফরাফ-এ আরোহণ, আরশে গমন ইত্যাদি ঘটনা বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী যারকানী (১১২২ হি) 'আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া' গ্রন্থের ব্যাখ্যা 'শারহুল মাওয়াহিব' গ্রন্থে আল্লামা রাযী কাযবীনীর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন:

لَمْ يَرِدْ فِيْ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ وَلاَ حَسَنٍ وَلاَ ضَعِيْفٍ أَنَّهُ جَاوَزَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، بَلْ ذُكِرَ فِيْهَا أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى مُسْتَوًى سَمِعَ فِيْهِ صَرِيْفَ الأَقْلاَمِ فَقَطْ. وَمَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ، وَأَنَّى لَهُ بِهِ! وَلَمْ يَرِدْ فِيْ خَبَرٍ ثَابِتٍ وَلاَ ضَعِيْفٍ أَنَّهُ رَقِىَ الْعَرْشَ. وَافْتِرَاءُ بَعْضِهِمْ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ.

"কোনো একটি সহীহ, হাসান অথবা যয়ীফ হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করেছিলেন। বরং বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তথায় এমন পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন যে, কলমের খসখস শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। যিনি দাবি করবেন যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করেছিলেন তাকে তার দাবীর পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে। আর কিভাবে তিনি তা করবেন! একটি সহীহ অথবা যয়ীফ হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, তিনি আরশে আরোহণ করেছিলেন। কেউ কেউ জালিয়াতি-মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। তাদের এরূপ মিথ্যাচারের প্রতি দৃকপাত করা যায় না।"

মে'রাজ বিষয়ক এ জাতীয় জাল ও বানোয়াট কথার মধ্যে রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর জুতা পায়ে আরশে আরোহণের গল্প, মে'রাজের রাত্রিতে "আত-তাহিয়্যাতু" লাভ, মুহূর্তের মধ্যে মি'রাজের সকল ঘটনা সংঘটিত হওয়া ইত্যাদি।

তথ্যসূত্রঃ https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7277

মে'রাজের রাতে খাজা বাবা রূহানী বেশে আগমণ করে বুরাকে হাত দিয়ে বুরাককে শান্ত করার কাহিনী বানোয়াট। সুতরাং মে'রাজ সম্পর্কে এ সকল কাল্পনিক ও মিথ্যা ঘটনা পরিহার করে তা থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের সকলের জন্য জরুরী।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ ২৭ বছর পর্যন্ত মে'রাজে থাকার গল্প কাল্পনিক।

বড় পীরের ঘাড়ে চরে সিদরাতুল মুনতাহা পার হয়ে আল্লাহর দরবারে পৌঁছার কিচ্ছা বানোয়াট।

২৭ রজবে বিশেষ ইবাদত পালন করা বা রজব দিবস পালন করা বিদআত। কারণ রসূল সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ শবে মে'রাজ উপলক্ষে কোন ইবাদত করেন নি বা করতে বলেন নি। সুতরাং দ্বীনের ক্ষেত্রে সকল নব আবিস্কৃত বিষয়ই বিদআত, যা থেকে দূরে থাকা সকল মুসলিমের উপর আবশ্যক। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

“যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় তৈরী করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। (বুখারী ও মুসলিম) তিনি আরও বলেনঃ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে, যে বিষয়ে আমাদের অনুমোদন নেই, তা আমলকারীর উপর প্রত্যাখ্যাত হবে। (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার কথাটি সঠিক নয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ) আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে আলেমদের মতবিরোধ বর্ণনা করেছেন। তবে বিশুদ্ধ কথা হলো, তিনি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেন নি। কারণ কোন সাহাবী স্বচক্ষে দেখার পক্ষে কোন বর্ণনা উল্লেখ করেন নি। ইবনে আববাস রাঃ থেকে যে বর্ণনা এসেছে, আল্লাহকে দেখার অর্থ হলো অন্তর চক্ষু দিয়ে দেখা। কপালের চক্ষু (চর্মচক্ষু) দিয়ে দেখা উদ্দেশ্য নয়। (যাদুল মাআদ, (৩/৩০) আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার ব্যাপারে আয়েশা রাঃ এর হাদীস:

عن عَائِشَةَ فَقَالَتْ ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ قُلْتُ مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ قَالَ قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ وَاللهُ يَقُولُ (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ وَاللهُ يَقُولُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ

আয়েশা রাঃ বলেনঃ যে ব্যক্তি বলবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রবকে স্বচক্ষে দেখেছেন সে আল্লাহর উপর বিরাট মিথ্যারোপ করল। যে ব্যক্তি বলবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ গোপন করেছেন, সে আল্লাহর উপর বিরাট মিথ্যা রটনা করল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ হে রসূল! পৌঁছে দাও তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি তুমি এরূপ না করো, তবে তুমি তার পয়গাম কিছুই পৌঁছালেনা। (সূরা মায়িদাঃ ৬৭) আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (গায়েবের) আগাম খবর দিতে পারতেন সেও আল্লাহর উপর চরম মিথ্যা রটনা করল।” (তিরমিযী-সহীহ) তিনি আল্লাহর খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং অন্তর দিয়ে তা অনুভব করেছেন। কিন্তু স্বচক্ষে দেখার কোন দলীল পাওয়া যায় না।

শিরনি করা

শবে মে'রাজের তো ভিত্তি আছে যে এ রাতে রাসুল সাঃ ঊর্ধ্বাকাশে গমন করেছিলেন। কিন্তু আজকাল ফরজ-ওয়াজিবের মতো যে জিনিসটি ছড়িয়ে পড়েছে, তাহলো শিরনির আয়োজন। শিরনি না করলে যেন মুসলমানই নয়। নামাজ পড়ুক না পড়ুক, রোজা রাখুক বা না রাখুক, গুনাহ পরিত্যাগ করুক বা না করুক শিরনি কিন্তু করতেই হবে। কেউ যদি শিরনি না করে অথবা শিরনি করতে বাধা দেয় তাকে সব ধরনের নিন্দা করা হয়। আল্লাহই জানেন, এ শিরনি প্রথা কোত্থেকে এলো। না কোরআনে আছে, না হাদিসে আছে। না সাহাবায়ে কেরাম করেছেন, না তাবেঈন, না তাবে তাবেঈন করেছেন, না বুজুর্গানে দ্বীন করেছেন। এর কোনো ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

কুসংস্কারে হারিয়ে গেল উম্মত

এসব জিনিস উম্মতকে কুসংস্কারে লিপ্ত করেছে। এ ধরনের বিষয়কে আবশ্যক মনে করা হচ্ছে। বাস্তব ও সঠিক জিনিসগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। মুসলমান ভাইদের বিষয়টি বোঝাতে হবে। এ জন্য যে, অনেক মানুষই না বুঝে করছে, মনে কোনো একগুঁয়েমি নেই। তারা দ্বীন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। এ বিষয়টি তারা জানে না। এসব মানুষের বিনয় ও ভদ্রতার সঙ্গে আন্তরিকভাবে বোঝানো উচিত। এ ধরনের কাজ থেকে নিজেরও বেঁচে থাকতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ
https://www.kalerkantho.com/print-edition/dhormo/2014/05/23/87496

মে’রাজের শিক্ষা

১) ঈমানী পরীক্ষাঃ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল মাকদিস ভ্রমণ করে এসে সকালে মানুষের কাছে তা বলতে শুরু করলেন। এ ঘটনা শুনে কতিপয় দুর্বল ঈমানদার মুরতাদ হয়ে গেল। মুশরিকদের কিছু লোক দৌড়িয়ে আবূ বকর (রাঃ) এর নিকট গিয়ে বললঃ তোমার বন্ধুর খবর শুনবে কি? সে বলছে, আজ রাতের ভিতরেই সে নাকি বায়তুল মাকদিস ভ্রমণ করে চলে এসেছে। তিনি বললেনঃ আসলেই কি মুহাম্মাদ তা বলছে? তারা এক বাক্যে বললঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ যদি বলেই থাকে, তাহলে সত্য বলেছেন। তারা আবার বললঃ তুমি কি বিশ্বাস কর যে, সে এক রাতের ভিতরে বায়তুল মাকদিস ভ্রমণ করে সকাল হওয়ার পূর্বেই আবার মক্কায় চলে এসেছে? উত্তরে তিনি বললেনঃ আমি এর চেয়েও দূরের সংবাদকে বিশ্বাস করি। তাঁর কাছে সকাল-বিকাল আকাশ থেকে সংবাদ আসে। আমি তা বিশ্বাস করি। সে দিনই আবূ বকর (রাঃ) কে পরম সত্যবাদী তথা সিদ্দীক উপাধীতে ভূষিত করা হয়।[41]

২) দাঈদের জন্য শিক্ষাঃ

মে'রাজের ঘটনায় দ্বীনের দাঈদের জন্য এক বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। তিনি প্রচারক মে'রাজ থেকে ফেরত এসে মানুষের কাছে ঘটনা খুলে বলতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ আমার আশঙ্কা হচ্ছে, লোকেরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলবে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তাদের কাছে ঘটনা খুলে বলবো। আমাকে তারা মিথ্যাবাদী বললেও। সুতরাং দ্বীনের দাঈগণের উচিত, সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তারা কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করবে না এবং মানুষ সেটাকে গ্রহণ করবে কি করবে না- এ ধরণের কোন চিন্তা-ভাবনা করবে না; বরং বলিষ্ঠ কন্ঠে মানুষের সামনে সত্যকে তুলে ধরবে।

---

[41] হাকেম, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৮১, হা/ ৩১৮২, ইমাম আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৩) কেন আল্লাহ শুরুতেই ৫ ওয়াক্ত স্বলাত না দিয়ে পর্যায়ক্রমে কমালেন?

কোরআনে আল্লাহ অনেক জায়গায় বলেছেন যে, তিনি আমাদের জন্য কাঠিন্য চান না, সহজতা চান। আর তাই রাসূল সাঃ যতবার আল্লাহর কাছে গিয়ে উম্মতের সহজতার জন্য ফরিয়াদ করেছেন ততবার আল্লাহ তা শুনেছেন এবং মঞ্জুর করেছেন। মূলত এর মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার প্রতি তাঁর দয়া ও রহমতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

এর মধ্যে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। আল্লাহ কোরআনে স্পষ্টই বলেছেন- জ্বীন এবং মানুষকে কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। ২৪ ঘন্টায় ৫০ ওয়াক্ত স্বলাত আদায় করতে হলে (অর্থাৎ প্রতি ৩০ মিনিটে ১ ওয়াক্ত) স্বলাত ছাড়া মানুষ আর কোনো কাজই করতে পারতো না। আসমানের ফেরেশতাগণও প্রতি মূহুর্তে আল্লাহর ইবাদাতে রত আছে। আল্লাহর ইবাদাতের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করা বান্দার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বান্দার দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর ইবাদাতের গুরুত্ব মানুষকে বোঝানোর জন্যই আল্লাহ প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত স্বলাতের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৪) আল্লাহ্ তা‘আলা যে আরশে আযীমে সমুন্নত মে'রাজের ঘটনা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ আল্লাহ্ তা‘আলা আরশে এবং আসমানে না হলে উপরের দিকে মে'রাজ হওয়ার কোন অর্থ হয় না।

৫) সকল ইবাদতের মধ্যে সলাত হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কারণ আল্লাহ্ তা‘আলা অন্যান্য ইবাদত যমীনে ফরয করেছেন। আর সলাত ফরজ করেছেন তাঁর প্রিয় বন্ধুকে কাছে ডেকে নিয়ে সাত আসমানের উপরে। এতে সলাতের গুরুত্বের কথাটি সহজেই অনুধাবন করা যায়।

৬) আল্লাহর সাথে বান্দার আবদিয়াত তথা দাসত্বের সম্পর্ক মজবুত করা।

৭) সলাত পরিত্যাগ করা কঠিন অপরাধ। তাই বেসলাতীর শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর।

৮) সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলোর শিক্ষা ও মর্মগুলো ধারণ করা। এখানে মুমিনের ঈমানের শিরোনামগুলো সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে।

৯) আল্লাহর হক ও বান্দার হকের প্রতি যত্নশীল হওয়া।

১০) হাউযে কাউসারের প্রত্যাশী হওয়া।

১১) ব্যভিচার একটি ঘৃণিত কাজ। এর শাস্তিও অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

১২) সুদখোরের ভয়াবহ পরিণতি।

পরিশিষ্ট

শবে মে'রাজ বিশ্বনবী সাঃ এর এমন এক অনন্য সাধারণ নেয়ামত যা পৃথিবীর বুকে আজ পর্যন্ত অন্য কেউ পায়নি। উম্মতে মুহাম্মাদী হিসেবে এটি আমাদের জন্যও গর্ব এবং সম্মানের বিষয়। কিন্তু ইসলামের অন্য অনেক বিষয়ের মতো শবে মে'রাজ নিয়েও আমাদের মধ্যে অনেক ভ্রান্ত কাহিনী ও আক্বিদা ছড়িয়েছে এবং এই রাতকে ঘিরে জন্ম হয়েছে অনেক বিদয়াতি আমলের। আমরা শবে মে'রাজের বিশেষ নামাযের রাকাত সংখ্যা জানার জন্য তৎপর(যা মূলতঃ বিদয়াত), কিন্তু এই রাতে পাওয়া উম্মতে মোহাম্মাদীর জন্য এক বিশেষ নেয়ামত এবং গুরু দায়িত্ব দৈনিক

পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়ে আমরা উদাসীন। শবে মে'রাজ সম্পর্কে নিজে সঠিক আক্বিদা পোষণ করা, বিদয়াত থেকে বেঁচে থাকা, এর প্রকৃত শিক্ষার উপর আমল করা এবং অন্যদের কাছে এর সঠিক তথ্য পৌঁছে দেয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সেই তাওফিক দিন। আমীন।

Assignment prepared by:

Mahfuza Haque

Batch - 202

Roll No - 20202178

Islamic Online Madrasa

Education - B.Sc in Computer Science & Engineering

Occupation - Homemaker

Address - H#210, Besides Biva Academy, Shialdanga Road. Dakshin khan Dhaka-1229

Phone- 01923350850

Email ID - mahfuza.haque87@gmail.com